আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত

সুকুমারী ভট্টাচার্য

দুটি কথা

রামায়ণ আকৃতিতে অনেক ছোট। মহাভারতের এক-চতুর্থ শেরও কম। কাজেই এটা পড়ে শেষ করা এবং রসগ্রহণ করাও কম সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সাধারণ পরিবারিক সমস্যা বাদ দিলে থাকে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সত্যকার জটিলতা খুব কম, ফলে এর রসগ্রহণ করা আপেক্ষাকৃত সহজ। চিরদিনই মানুষ সহজ পেলে কঠিনকে বর্জন করে; এখানেও কতকটা সেই ব্যাপারই ঘটেছে। যাকে সহজ বুঝি তা যেমন সহজে জীবনের অঙ্গাঙ্গী অংশ হয়ে ওঠে, কঠিন তা হয় না। সে দাবি করে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং একনিষ্ঠ চিন্তা। মহাভারতের এই দাবিই তাকে দুরূহতার করেছে। কিন্তু, যে যথাযথ আগ্রহ ও নিষ্ঠায় অন্তর দিয়ে, মহাভারতের মূল সন্ধান করে সে পায় বেশি। জীবননিষ্ঠ জীবনবোধ। মহাভারত এই কারণে মহত্তর। বর্তমান প্রবন্ধটিতে ভারতের দুই মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারতের, যথাক্রমে জনপ্রিয়তা ও জীবননিষ্ঠা নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেছি। ‘গাঙচিল থেকে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সংকলনের জন্য লেখাটি যথাসম্ভব পরিমার্জিত করার চেষ্টা করেছি। এর পাদটীকাগুলি পুণের সংশোধিত সংস্করণের মহাভারত এবং গোরখপুর গীতা প্রেস-এর রামায়ণ থেকে নেওয়া।

রামায়ণের সহজ আবেদন

বেদ ভারতবর্ষের ব্যাপক জনসাধারণের ধর্মগ্রন্থ নয়, তা হল রামায়ণ ও মহাভারত। এ দেশে গত দু’হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ তার সংকটের মুহূর্তে যে গ্রন্থ থেকে দিকনির্দেশ খুঁজছে তা হল এই দুটি মহাকাব্য। অতএব এর পর্যালোচনার দাবিটি উপেক্ষা করা যায় না। দুটি মহাকাব্যেরই পরিণতি এসেছে একটি বড় মাপের যুদ্ধের পরে। অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্য নিলেন। বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বানররাজ সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠিয়ে

সীতার সন্ধান করলেন, এবং পরে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সসৈন্যে গিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধ নির্মাণ করে অন্যপারে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হলেন। বানরসেনা কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, যা অস্ত্রশস্ত্র তা ওই রাম লক্ষ্মণ দু-ভাইয়ের। তারই বা পরিমাণ কত হতে পারে? হনুমান যখন লঙ্কায় গিয়ে ঘুরে সব দেখছিলেন তখন কিন্তু একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানীর সমস্ত সম্ভার এমনকী প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।'(১) যুদ্ধে রাক্ষসসেনা সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র মানুষ সেনার মতোই লড়াই করেছিল। অযোধ্যায় সামরিক প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা যে রকম, লঙ্কাতেও ঠিক সেই রকমেরই ছিল। ব্যতিক্রম বানর সেনা; যারা নিরস্ত্র, শুধু হাতে পাথর ছুড়ে, গাছ উপড়ে ফেলে যুদ্ধ করেছিল। রামের সেনা বলতে এরাই। শিক্ষিত রাক্ষসসেনা হেরেছিল। এই নিরস্ত্র বানরসেনা এবং দুটিমাত্র অস্ত্রধারী যোদ্ধা–রাম, লক্ষ্মণের কাছে। এই সাংঘাতিক অসম যুদ্ধে একটা অতিলৌকিক উপাদান থাকবেই এবং ছিলও। গন্ধমাদন পর্বতবিয়ে নিয়ে আসা এবং সেখানকার ভেষজ বিশল্যকরণীর সাহায্যেযুদ্ধে প্রায়-পরাস্ত হতচেতন লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে আসে। যুদ্ধে মায়া-সীতা দেখানো, রামের মুণ্ড দেখানো এবং নানা মুনিঋষি এবং দেবতাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এ সবই অলৌকিক ঘটনা।

বিস্তর অলৌকিক ঘটনা সারা রামায়ণ জুড়েই আছে। গল্পের শুরু ঠিক রূপকথার মতোই: এক রাজা, তাঁর তিন রানি, রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। ছেলে যে হল সে-ও রূপকথারই মতো অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। তার পর কিশোর রাম-লক্ষ্মণকে নিতে এলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর আশ্রমে রাক্ষসরা বেজায় দৌরাত্ম্য করছে, তাদের ঠেকাতে হবে। প্রথমত, রাক্ষসরা ভয়ানক শক্তিশালী জীব, তাদের হারাতে নিয়ে যাওয়া হল দুটি কিশোরকে। পথে অহল্যার কাহিনিতে দেখানো হল রাম সাধারণ মানুষ নন। যাই হোক, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসদের হারানো, এও প্রায় অলৌকিক ঘটনারই পর্যায়ে পড়ে। তার পরে বিয়ে। ওই কিশোরই হরধনু ভাঙল, যা বড় বড় বীর পারেনি। বিয়ের কিছুকাল পরেই যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময়ে সব কিছু ভেস্তে গেল কৈকেয়ীর আবদারে: কবে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ দুটি বর দিয়েছিলেন, সেই সুবাদে রামকে বনবাস দিয়ে ভরতকে রাজা করার দাবি তুললেন কৈকেয়ী, এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতির দায়ে রাজাকে তা-ই করতে হল। এখানে রূপকথার অন্য একটি আনুষঙ্গিক অংশ জুড়াল; রাজার ছেলে বনবাসী হল। এটা বহু রূপকথায় ঘটেছে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেলেন। এখানে তাঁদের জীবনের দুটি অংশ: এক, দৈনন্দিন জীবনে ক্লেশ, কুঁড়ে ঘরে বাস, ফল পাকুড় এবং শিকারের মাংসে দিনযাত্রা নির্বাহ। এর অবশ্য একটি কাব্যিক দিকও আছে। কিন্তু বনে কখনও বাঘ সিংহ তাদের আক্রমণ করেনি, সাপ-বিছে কামড়ায়নি। এত অহিংস জঙ্গল বাস্তবে মেলে না। দ্বিতীয়ত, এখানে ওই সদ্য তরুণ দুটি রাজপুত্র, ধনুর্বাণ, বর্শা, তরবারি দিয়ে হাজার হাজার

ভয়ংকর রাক্ষসকে প্রায়ই মেরে ফেলতে লাগলেন। এ অংশটা স্পষ্টতই অলৌকিক। যদি মনে রাখি যে, আদিকাণ্ডের প্রথমার্ধ ও উত্তরকাণ্ড বাদে বাকি অংশটাই আদি রামায়ণ এবং এ অংশে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, 'নরচন্দ্রমা',(২) তা হলে সামান্য অস্ত্রে দুটি তরুণের হাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী অগণ্য রাক্ষসের মৃত্যু-এ-ও অলৌকিক উপাদান। বনবাস পর্বে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চর ঘটেছে, খরদূষণ-তাড়কাশূর্পণখা উপাখ্যানে; এরা সবাই রাম লক্ষ্মণের হাতে পরাস্ত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে।

এই নির্যাতনের খবর পৌঁছেছে লঙ্কায়, সেখানে রাজা রাবণ রাম লক্ষ্মণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায় সীতা হরণের জন্য মারীচের শরণ নিলেন। মারীচ এল সোনার হরিণের রূপ ধরে; আরও একটা অলৌকিক মাত্রা যুক্ত হল কাহিনিতে। সোনার হরিণ দেখে সীতা জেদ ধরলেন, ওই সোনার হরিণ তাঁর চাই। রাম হরিণের পিছু পিছু গেলেন। কুটীরে লক্ষ্মণ ও সীতা শুনতে পেলেন রামের গলা, 'বাঁচাও'। সীতা জোর করে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামের নিরাপত্তার জন্যে। এ বার কুটীরে একলা সীতার কাছে ছদ্মবেশী রাবণ ভিক্ষা নিতে এসে জোর করে তাঁকে রথে তুলে রওনা হলেন। ছদ্মবেশও একটা অলৌকিক ব্যাপার, পুস্পক-রথও তাই। লঙ্কায় সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখা হল, কারণ তিনি রাবণকে ভজনা করতে সম্মত হননি। রাবণ ধমকে বলে গেলেন, দু-মাসের মধ্যে সীতা রাজি না হলে তাকে মেরে কেটে খাওয়া হবে।

এদিকে রাম কুটীরে ফিরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ঘটনাচক্রে সুগ্রীবের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হল, এটাও লৌকিকের সীমা ছাড়িয়ে; মানুষে-বানরে বন্ধুত্ব। বলা বাহুল্য, এ-বানর পরিচিত সলাঙ্গুল বানরের মতো নয়, এরা মানুষের মতো কথা বলে, এবং এদের আচরণও মানুষেরই মতো। চর পাঠিয়ে সুগ্রীব সীতার সন্ধান পেলেন। হনুমান গেল। লাফ দিয়ে সাগর পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে–এ-ও অতিলৌকিক ঘটনা। তেমনই অতিলৌকিক পথে রাক্ষসী সিংহিকাকে মেরে ফেলার ঘটনা। রাম লক্ষ্মণ বানরসেনার সাহায্যে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করলেন সেও সাধারণ সম্ভাব্যতাকে লঙ্ঘন করে। যুদ্ধে অতিলৌকিক ঘটনা বেশ কয়েকটাই ঘটে, কিন্তু নিরস্ত্র বানরসেনার হাতে ও ধনুর্বাণধারী রামলক্ষ্মণের হাতে সুশিক্ষিত সশস্ত্র রাক্ষসসেনার পরাভব, এইটেই সবচেয়ে বড় অলৌকিক। যুদ্ধের পরে রাম সীতাকে সর্বজনসমক্ষে পরিত্যাগ করলে সীতা চিন্তারোহণ করেন। দেবতারা ও দশরথ এসে তাঁর 'সতীত্ব' প্রতিপাদন করেন, এটাও অলৌকিক। যেমন অবাস্তর পুষ্পক রথে দেশে ফেরা।

কাজেই দেখছি, পদে পদে অলৌকিকতার অবতারণা এবং রূপকথার মতো দুর্বল পক্ষের সবল পক্ষকে পরাস্ত করা এ সবই ব্যবহার করা হয়েছে, কাহিনিটিকে বাস্তব অর্থাৎ মানুষের পরিচিত জগৎ থেকে সরিয়ে অন্য এক স্তরে উন্নীত করবার জন্যে; সেখানে বাস্তব অবাস্তবের ভেদ নেই, গল্পের মধ্যে কাহিনিগত, চরিত্রগত বিশেষ কোনও জটিলতা নেই। যখনই কাহিনির প্রয়োজনে কোনও ব্যাপার ঘটা দরকার, যেটা

বাস্তবে ঘটা অসম্ভব, তখনই অতিবাস্তবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে কাহিনিটির জনপ্রিয় হওয়া আরও সহজ হয়েছে। লোকে বারে বারে সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা পেয়েছে, কাহিনির মধ্যে পেয়েছে রোমহর্ষক উপাদান এবং অলৌকিকের বহুল প্রয়োগ, যা রূপকথার উপাদানের মতো এটিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে।

জীবনের যে ধরনের মূল্যবোধ রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূলত পরিবারনিষ্ঠ। পিতা-পুত্র (রাম-লক্ষ্মণ ও দশরথ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ), মাতা-বিমাতা (কৌশল্য-কৈকেয়ী), পারিবারিক ক্ষমতালোভে ষড়যন্ত্র (কৈকেয়ী-মন্থরার রামের বিরুদ্ধে ভরতের দাবি উপস্থাপন করা), সৌভ্রাত্র্য (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত), ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, (বালী-সুগ্রীব, রাবণ-বিভীষণ), পরস্ত্রীহরণ ও ভোগ বা ভোগের চেষ্টা (রুমা-তারা, সীতা), বন্ধুকৃত্য (জটায়ু-সম্পাতি রামলক্ষ্মণের সহায়তা করেন। দশরথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে), দাম্পত্যের ত্রুটি ও বিকৃতি (বালী-সুগ্রীবরাবণ), অনুচরের আনুগত্য (হনুমান), দাসীর দৌরাত্ম্য (মন্থরা), ভ্রাতৃবধু-দেবীর (সীতালক্ষ্মণ), আরও ছোটখাটো শাখায় পল্লবে নানা উপকাহিনিতে এই ধরনের পারিবারিক মূল্যবোধের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে। সমাজের মানুষ প্রতিনিয়ত অব্যবহিত ভাবে যে সব সম্পর্কের জটিলতার সম্মুখীন হয় এবং প্রায় প্রত্যহ পদে পদে যে সব সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, রামায়ণ সেই নীতি-দুনীতি-সুনীতির সম্বন্ধে পারিবারিক ও কতকটা সামাজিক অক্ষাংশে তার সম্বন্ধে দিকনির্দেশ দিয়েছে। পরিবারবদ্ধ সমাজজীবনে মানুষ স্বভাবতই চেয়েছে পারিবারিক সম্পর্কে সংঘাত ও সংশয়ে মহাকাব্যের কাছ থেকে আচরণের বিধি ও মূল্যবোধের দিশা। পারিবারিক সম্পর্কের সংঘর্ষেকী করণীয়, কেমন ভাবে তা করণীয়, তা দেখাক মহাকাব্য। খ্রিস্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ সাম্রাজ্যের কালে ভারতবর্ষে একটি ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ঘটে। এর ফলে প্রচলিত সমাজবিধির বিশ্লেষণ করে নতুন, সার্বিক ভাবে গ্রহণীয় যে আচরণবিধি প্রবর্তিত হল, সেই পরিবর্তিত বিধানই হল এই মূল্যবোধের উৎস। রামায়ণের সমকালীন ভগবদগীতা, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, মনুসংহিতা, সংস্কৃত জাতকের কিছু অংশেও এই মূল্যবোধই প্রতিফলিত। এর বিশদ আলোচনা না করেও সাধারণ ভাবে বলা যায়–জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার বিকল্প, অতএব সর্বতো ভাবে তাঁর বাধ্য হওয়া উচিত। পিতা দেবকল্প, তার আদেশ নির্দেশ একান্ত ভাবেই অলঙ্ঘনীয়।' বন্ধুর দাবি রক্ষণীয়। অনুগতের আশ্রয়স্থল হওয়ার দায়িত্ব আছে। দাম্পত্যে স্বামীই প্রভু, স্ত্রীর স্থান তার অনেক নিচে; কাজেই স্বামীর সেবা ও অভিলাষপূরণ স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। যত দিন দাম্পত্যপ্রেম উভয়ত প্রবাহিত, তত দিন স্ত্রীর একটা স্থান আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ স্ত্রীকেও সন্দেহ বশে বারবার প্রত্যাখ্যান করা সংগীত; কারণ সমাজে সতীত্ব' একটি সর্বজনস্বীকৃত মূল্য। কিন্তু সতীর কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ না থাকায় স্বামীকে স্ত্রী-র সন্দেহ করার হেতু থাকলেও কোনও অবকাশ থাকে না। বংশমর্যাদা একটি সমাজস্বীকৃত মূল্য। তাই যুদ্ধ শেষে রাম সীতাকে বলতে পারলেন, 'যুদ্ধ করেছি ইক্ষুকু কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য, অর্থাৎ তোমার জন্যে নয়। তাই যুদ্ধের শেষে অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন ভরত, রামের বৈধ উত্তরাধিকারী

লব কুশ নয়। শূদ্র ও চণ্ডাল ঊনমানব, তাই গুহক চণ্ডালের কাছে ফলমূলও গ্রহণ করা যায়নি (যদিও বনবাসী অবস্থায় মুনিঋষিদের আতিথ্য গ্রহণ করতে রামের বাধেনি)।(৩) আর ব্রাহ্মণ সন্তানের বাজারদার চণ্ডালের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি, তাই অকালমৃত ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রাণের মূল্য শোধ করতে হল চণ্ডাল শঙ্কুককে নিজের প্রাণ দিয়ে। দু-একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র বা ঘটনা থাকা সত্ত্বেও এই হল ওই সময়কার সমাজের মূল্যবোধের ছক। নারীর বা শূদ্রের সামাজিক অবস্থান উচ্চত্রিবর্ণের ও পুরুষের পায়ের নিচে।

ধর্মশাস্ত্র ও সমাজপতিরা যে ছকটি ধরে দিয়েছিল তা নিয়ে রামায়ণে কোনও সংঘাত নেই। মূলত পরিবারনিষ্ঠ ও সমাজনিষ্ঠ এ মূল্যবোধ সরলরৈখিক ভাবে রামায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে পাঠক শ্রোতাকে তাই তেমন কোনও মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না। কাহিনিটিকে প্রচুর রূপকথার উপাদানে মণ্ডিত করে, অলৌকিকতায় ভরে দিয়ে সমৃদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারীর অবদমন, শূদ্রের সেবকত্ব, চণ্ডালের উপান্তবর্তিত্ব, রাজার গৌরব, স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার দেবতুল্য মহিমা প্রচার অতি সহজ ভাবে করা হয়েছে। আরও সহজ হয়েছে এর প্রক্ষিপ্ত অংশে মানুষ রামের বিষ্ণুর অবতার হয়ে ওঠায়, সীতার লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলে উল্লেখিত হওয়ায়। কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি যে, লক্ষ্মীর তা পূর্বজন্মে কোনও পাপ থাকার কথা নয়, তা হলে সীতা শেষ দুটি কাণ্ডে এত নির্যাতন, প্রকাশ্য অপমান, ও বারবার নির্বাসনের যন্ত্রণা ভোগ করলেন কেন। এ কেনার উত্তর অতিকথায় মিলবে না, মিলবে তৎকালীন আর একটি মূল্যবোধে: স্ত্রী যথার্থ সতী না হলে সন্তানের পিতৃত্ব সংশয়িত হয় এবংসন্তানই তো পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই স্ত্রীর প্রতি অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হলেও তাকে ত্যাগ করা চলে। নইলে ঋষি বাল্মীকি যার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে উক্তি করেন তাকেও গ্রহণ করতে বাধে স্বামীর? অযোধ্যার লোকে বলেছিল,'(৫) পরহস্তগত নারীকে যদি রাম গ্রহণ করেন তবে তো আমাদেরও ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে। সমাজে এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় মূল্যবোধেরই আধিপত্য এবং এই মূল্যবোধকে ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে রামায়ণ। এক দিকে তার রূপকথাধর্মিতা, অলৌকিকত্ব-সিঞ্চিত কাহিনির অতি সহজ আবেদন, অন্যদিকে মানুষ যে মানদণ্ড ধরে নির্দ্ধান্দুে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। তার এমন সরল উপস্থাপনাকাজেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। এ মহাকাব্যে সাড়া দিতে হলে কোনও বিশেষ নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না, যা কিছু নৈতিক সংঘাতের উপাদান ছিল কাহিনিতে তার নিঃসংশয় সমাধান ঘটেছে; পাঠকশ্রোতা আদর্শ হিসেবে এ মূল্যবোধ মেনে নিলে তাকে বড় কোনও মানসিক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয় না। সাধারণ পাঠক এ-ই চায় এবং রামায়ণ কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করে তাকে এটাই দিয়েছে, কাজেই সমগ্র আর্যাবর্তে রামায়ণের অপ্রতিদ্বন্দ্ব জনপ্রিয়তা ঘটেছে। রামায়ণে কিছু কিছু নৈতিক সংঘাত অবশ্যই আছে, সেগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য, তবু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশ সংঘাতই

পাঠককে উদ্রান্ত বা যন্ত্রণাতুর করে তোলে না। পরিমাণগত ভাবে তাই এই কাব্যের সংকট এর সহজ আবেদনকে জটিল করে তোলেনি।

মহাভারতের দ্বন্দ্ব

মহাভারতে কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কগুলি রামায়ণের মতো আদর্শ ভাবে চিত্রিত নয়। অযোধ্যায় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে বিমাতার বিদ্বেষ রামচন্দ্রের বনবাসের হেতু, কিষ্কিন্ধ্যায় বালী-সুগ্রীবের বিরোধ ও লঙ্কায় বিভীষণের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আনুগত্য ত্যাগ, ব্যতিক্রমী ঘটনা বলতে এই কটিই। না হলে দশরথের চারটি পুত্রের মধ্যে আদর্শ সৌভ্রাত্র্য, মৃত্যুকালে বালী ও সুগ্রীবের পুনর্মিলন ও সুগ্রীবের হাতে বালীর নিজপুত্র অঙ্গদকে সমর্পণ, লঙ্কায় রাবণ, শূর্পণখা, কুম্ভকর্ণের সৌভ্রাত্র্য (যেমন জটায়ু সম্পতিরও), এবং সর্বত্রই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য, পিতার প্রতি পুত্রের বাধ্যতা— বন্ধুদের মধ্যে সখ্য, গুরুজনদের প্রতি বশ্যতা, এ সব নৈতিক আদর্শ অনুসারেই চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে প্রাথমিক বিরোধই হল এক বংশের দুই ধারার মধ্যে তৎকালীন সম্পর্কে যারা ভাই। বিরোধ সম্পত্তি অর্থাৎ সিংহাসনে অধিকার নিয়ে এবং বিষয়টি সত্যিই জটিল, সহজে সমাধেয় নয়। যুধিষ্ঠিরের জন্ম আগে, সে দিক থেকে সিংহাসনে তাঁর অগ্রাধিকার; কিন্তু তাঁর জন্ম পাণ্ডুর ঔরসে নয়, এবং পাণ্ডুর প্রজনন ক্ষমতা না থাকা তাঁর অধিকারকে বিসংবাদিত করে। তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বও তৎকালীন আইনে সিংহাসনে তার অধিকারকে সংশয়িত করে। কাজেই বিষয়টি জটিল ও সমস্যাসংকুল।

রামায়ণে সীতাকে হরণ করে কামুক এক রাক্ষস; মহাভারতে দ্রৌপদীর ওপরে কামনা ছিল দুর্যোধন ও কর্ণের। হরণ না করলেও প্রকাশ্য সভায় তাঁর অকথ্য অসম্মান ঘটায় যারা, তারা সম্পর্কে তাঁর ভাসুর; এবং জড়বৎ আচরণ করে সে অসম্মানকে সহ্য করেন যারা তাঁরা তাঁর শ্বশুর। রামায়ণে সম্পর্কে শ্বশুর-স্থানীয় (দশরথের সখা) জটায়ু বন্ধুপুত্রের বধূকে অবমাননা থেকে রক্ষা করতে চেয়ে প্রাণীই দিলেন। দ্রৌপদীকে একবার জয়দ্রথ হরণ করে, কিন্তু স্বল্প কালের মধ্যেই সে দণ্ডিত হয় এবং ওই হরণের অভিযোগে— পরপুরুষের স্পর্শের দোষে–সীতাকে রাম যেমন প্রত্যাখ্যান করেন, পঞ্চপাণ্ডবের মনে কিন্তু দ্রৌপদীহরণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বৈকল্য দেখা দেয়নি।

রামায়ণের যুদ্ধ দূরদেশবাসী অনাত্মীয়, অপরিচিত, শত্রুপক্ষ রাক্ষস রাবণের সঙ্গে; মহাভারতে তা নয়। ওখানে কারণটা খুব সঙ্গত ছিল; রাবণ রামের স্ত্রীকে হরণ করেছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠির পৈত্রিক অধিকারে সিংহাসন দাবি করলে শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করা হয়। যুধিষ্ঠির খেলায় দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু রাজি না হলে সম্মানহানি হবে এ আশঙ্কায় রাজি হন এবং একে একে সব কিছু পণ রেখে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিলে তিনি একে একে স্বামীদের মুক্তি চেয়ে নিলেন। তখন আবার শকুনিকে দিয়ে কর্ণ ও দুর্যোধনের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানান এবং দ্বিতীয় বারেও একে একে সমস্ত সম্পত্তি, চার ভাইকে, নিজেকে ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে হারিয়ে শর্ত অনুসারে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে বনে চলে যান।(১)

এই উপাখ্যানের মধ্যেই নিহিত আছে মহাভারত সম্পর্কে জনসাধারণের সংবেদনে একটা গুরুতর প্রত্যব্যায়। দ্রৌপদী যে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত হলেন এ ব্যাপারটার কোনও সরব প্রতিবাদ তেমন হল না। প্রথম দ্যূতসভায় বিদুর প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু তার তো কোনও সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা এমনকী পারিবারিক প্রতিপত্তিও ছিল না, যার বলে লোকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে; ফলে সে কথা উচ্চারিত হল বটে, কিন্তু উপেক্ষিত হল সম্পূর্ণ ভাবে। দ্বিতীয় দ্যূতসভায় বিকর্ণসকলের বিবেকের কাছে আবেদন করলেন এই বলে যে, কাজটা ক্ষত্রিয় নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ন্যায়নীতিরও বিরুদ্ধ। কিন্তু বিকর্ণ এমন কেউ নন যে, লোকে তার কথায় সাড়া দেবে। বলা বাহুল্য, বিদুর ও বিকর্ণ পাঠক শ্রোতার প্রতিবাদই উচ্চারণ করছেন এবং জীবনে যেমন প্রায়শই ঘটে তেমনই, এখানেও সুবিচারের জন্য আবেদন উপেক্ষিত হল। এক অর্থে এই-উপেক্ষার মধ্যেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার অভিঘাত পাঠকের বিবেক ও বোধের কাছে তীব্রতর হল এবং সমস্ত ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলল। এখানে মহাভারতের পাঠক বা শ্রোতা কী দেখছে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র এঁরা চুপ করে রইলেন, ন্যায়নীতির কোনও প্রশ্ন তুললেন না। বনবাস ও অজ্ঞাতবাস পাণ্ডবদের, কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনা প্রধানত দ্রৌপদীর।

দ্রৌপদী কে? একজন বিবাহিতা নারী, যার স্বামী তাকে পণ রেখে জুয়া খেলে হেরেছেন। অর্থাৎ যে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা বিপদ অসম্মান থেকে, সেই স্বামীই স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ঠেলে দিলেন। তাঁকে মর্মন্তুদ। অপমানের মধ্যে। নারীকে অপমান করা এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপায় নয়। শ্রোতা-পাঠকদের খানিকটা বিস্ময় উদ্রেক করলেও ব্যাপারটা বিবমিষা উৎপাদন করেনি। কিন্তু অবচেতনে সকলেরই একটা অস্বস্তি ছিল: দ্রুপদরাজকন্যা অপূর্ব রূপবতী, বহুগুণবতী, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারী যে প্রকাশ্য রাজসভায় অবমানিত এবং কেশাকর্ষণ, বেশাকর্ষণের মতো জঘন্য নির্যাতন ভোগ করলেন, এতে পুরুষশাসিত ও পুরুষপ্রধান সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে এর কোনও প্রতিবাদ না দেখেও অন্তরের অন্তঃ স্থলে

অবশ্যই কতকটা বিচলিত বোধ করেছিলেন। কারণ সমস্তটাই ছিল প্রথম থেকে নিবার্য: যুধিষ্ঠির জানতেন জুয়াখেলা পাপ, একবার হেরেও তাঁর চৈতন্য হয়নি, দ্বিতীয় বার সে পাপে যোগ দিলেন শকুনির মতো দুরাত্মার আহ্বানে। তার পর পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা যুধিষ্ঠির পণ রাখেন কোন অধিকারে? বড় ভাই পিতার মতো মাননীয়, কিন্তু বড় ভাই যেখানে বাকি চার ভাইয়েরও স্ত্রীর স্বামী, সেখানে তাঁর অন্য এক দায়িত্ব; জ্যেষ্ঠাধিকারের একটা সীমা আপনিই সংকুচিত হয়, তাই সেখানে যুধিষ্ঠির অন্যায় করেছেন। দ্বিতীয়ত, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছিল প্রতিকার্য, এবং সেটা নিবারণ করার দায় ছিল স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর, গুরু-আচার্যদের, সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের এবং সমগ্র পুরুষ সমাজের। বিদুর, বিকর্ণ, আর ভীম ছাড়া ক্ষত্রিয়োচিত, পুরুষোচিত এবং মানবোচিত প্রতিক্রিয়া কারও কাছেই পাওয়া যায়নি। পাঠক এতে কী ভাবে সাড়া দেবেন? সাহিত্যের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা চিত্তবিনোদন, রামায়ণ তা স্পষ্টতই স্বীকার করেছে; এ কাব্যে মনোরঞ্জনের উপকরণ প্রচুর। কিন্তু যেহেতু মহাকাব্য একটা যুগের, একটা জাতির অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে, তাই তার মধ্যে মহত্ত্বের উপাদান সঞ্চার করে ধর্মসংকট। দশরথ, রাম, রাবণ, ভরত, মারীচ, বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও সীতার জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এ সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র কাব্যের কলেবারের অনুপাতে তার পরিমাণ কম। তীব্রতাও স্বল্পস্থায়ী, তাই চিত্তবিনোদনই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মহাভারতে এই অনুপাত ঠিক বিপরীত; মনোরঞ্জনের তুলনায় আপাত বিভ্রান্তি ও সংকটই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই ঘটনাটি মহাভারতকে দুটি স্পষ্ট ভাগে খণ্ডিত করে দেয়; এর আগে কৌরবরা বহু অন্যায় করেছে।ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডবরা কৌশলে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়নীতি সম্বন্ধে দোলাচলচিত্ত ছিলেন, কখনও গান্ধারী, বিদুর বা কৃষ্ণের কথায় আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই কর্ণ শকুনি দুর্যোধনের মতে সায় দিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধু, পুত্রবধুর এই নির্যাতন, দুঃশাসনের প্রকাশ্য অন্যায্য আচরণ, দুর্যোধনের অসহ্য অপমানকর কটুক্তি, কর্ণের নীচ, অশালীন ইঙ্গিত, এই সব জেনেশুনেও সিংহাসনে স্থির ভাবে বসে থাকা, ন্যায়নীতিবোধের সমস্ত প্রেরণা উপেক্ষা করা, এর দ্বারাই ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবরা পরম পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। অত্যাচারিত পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরের প্রথম অন্যায় (পাশা খেলায় রাজি হওয়া) সত্ত্বেও, ছলনার দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে অসহায় ভাবে স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখতে বাধ্য হওয়ায়, এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারে সুদীর্ঘকালের জন্য বনে যেতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ শ্রোতাপাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে। এক ধৃতরাষ্ট্র নন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এঁরাও এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেন। গান্ধারী, বিকর্ণ ও বিদুর বাদে কেউই মনুষ্যত্বের ন্যূনতম সাক্ষ্য রাখতে পারলেন না। অথচ ব্যাপারটা সত্যিই তো জটিল। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তিনি জানতেন অক্ষক্রীড়া পাপ, তবু খেলেছেন। জানতেন, খেলায় তার দক্ষতা নেই, জানতেন শকুনি শঠ ও চতুর প্রতিপক্ষ, কাজেই জয়ের সম্ভাবনা নেই, তবুও খেলেছেন। কাজেই এখানে শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে কৌরব-

পাণ্ডব সম্বন্ধে পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় কোনও পক্ষ সুনিশ্চিত ভাবে স্থির করা যতটা কঠিন, কোনও পক্ষে রায় দেওয়াও সেই কারণে ততটাই কঠিন। ঘটনা এখানে জটিল, জটিলতর নৈতিক মূল্যবোধের আপাত-বিপর্যাস। জনসাধারণ চায় ভালমন্দ সাদা-কালোর মতো সহজে বিভাজ্য হোক, তা হলে শ্রোতা বা পাঠকের সাড়া দেওয়াতে কোনও সমস্যা থাকে না। যেখানে তেমনটি হয় না, সেখানে পাঠকের দ্বিধা ও অস্বচ্ছন্দ্য তার প্রতিক্রিয়াকে সংশয়িত করে তোলে। এমন সাহিত্য আর যাই হোক, সাধারণ ভাবে জনপ্রিয় হয় না।

এ ছাড়াও মহাভারতে পদে পদে নৈতিক মূল্যবোধে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষ চোখে পড়ে। দুর্যোধন যখন পুরোচনের সাহায্যে গূঢ় ভাবে জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের সেখানে বাস করতে পাঠালেন তখন বিদুর কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে এ খবরটি পাঠান। যে রাত্রে তাঁরা পালাবেন। সে রাত্রে কুন্তী এক নিষাদী ও তার পাঁচটি পুত্রকে নিমন্ত্রণ করে সুখাদ্যে ও সুরায় মত্ত অবস্থায় নিদ্রিত রেখে অগ্নিসংযোগের পূর্বেই পাঁচ পাণ্ডব পুত্রসহ পূর্বনির্মিত ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যান।'(৩) মহাকাব্যের পক্ষে পাণ্ডবদের বেঁচে থাকা দরকার, কারণ তারা দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ কৌরবদের ধ্বংস করবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কিন্তু পাঠক কি কোনও মতে ভুলতে পারে কুন্তীর নিজের সন্তানদের বাঁচানোর এই অপকৌশলের ফলে নিরীহ ছ'টি নিষাদ প্রাণ দিতে বাধ্য হল?(৪) আবার দেখুন, সমাজে নিষাদের অবস্থিতি আর্যদের নিচে। কাজেই এখানে প্রাণের যে আপেক্ষিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত একান্ত মানবিক নীতির নিরিখে তাকে মেনে নেওয়া কঠিন। নিষাদ নিচুস্তরের মানুষ, পাণ্ডবদের বাঁচাবার জন্যে ছলনার সাহায্যে যদি তাদের মরতে হয় তো ক্ষতি কী? ক্ষতি জাতিবর্ণবিভক্ত সমাজ হয়তো সহসা নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু অবচেতনের মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই বোঝে, সম্পূর্ণ নিরীহ মানুষ। শুধু নিম্নবর্ণে জন্মানোর দাম দেবে উচ্চবর্গীয় মানুষকে প্রাণ দিয়ে বঁচানোর জন্যএটা ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘন করে। আবারও দেখি, পরিস্থিতি এমন যে পাণ্ডবদের অগ্নিদাহে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গেলে এ ছাড়া পথও ছিল না। অথচ এ পথটি পঙ্কিল, অতএব নীতির দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পথ নয়। সাধারণ পাঠক এখানে এই মুহূর্তে কী ভাবে সাড়া দেবে? মূল মহাকাব্যের তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলতে বাধ্য হবে কুন্তীর কৌশলটির বিকল্প ছিল না, অথচ সাধারণ মানুষের বিবেকেও একটি কাটা ফুটে থাকে: কাজটা সত্যিই ঠিক হল কি? এই কঁটা রামায়ণের তিনটি ব্যাপারে–বালী-বধ, সীতাপরিত্যাগ ও শম্বুকবাঁধেও বড় করেই ফোটে, অন্তত ফোটা উচিত। কিন্তু রামায়ণ তিনটি ক্ষেত্রেই নানা বাগজাল বিস্তার করে তখনকার সামাজিক মূল্যবোধকে সমর্থন করেছে: ঊনমানব বালীর বন্ধ রামচন্দ্রের নিজের স্বার্থসিদ্ধির (সীতা উদ্ধারের) জন্যে, পরপুরুষ সম্পর্শে দুষ্ট নারী স্বামীর পক্ষে 'অভোগ্য' বলে সীতাপরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণদানের জন্যে চণ্ডাল শল্লুকের অনিবার্য প্রাণহরণ। এতে রামায়ণ সরল হয়েছে; কিন্তু মহাভারতে পদে পদে দ্বন্দ্ব; জটিল তার পথ।

দেবতা না মানুষ?

মহাভারতের মতো গ্রছিল মহাকাব্যটির সুর অনেকটাই খাদে নেমে এসেছে শেষের দুটি অংশ– 'মহাপ্রস্থান' ও 'স্বর্গারোহণ' পর্বে, কিন্তু পুরোপুরি নামেনি, মাঝে মাঝে উঁচু পর্দাতেও উঠেছে। মৌষলপর্বে অর্জ্জুনের কাছে যদুকুল ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে একটা বৈরাগ্য এল, অর্জ্জুনেরও কৃষ্ণের বিরহে কষ্ট এবং কৃষ্ণের শেষ ইচ্ছ–তীর রাজ্যের নারীদের রক্ষণ করা–রাখতে না পারার জন্যে মর্মান্তিক যাতনা হল। যুধিষ্ঠির বললেন 'কাল' আমাকে আকর্ষণ করছে। আমি আর সংসারে থাকব না।'(১) অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীরও মনে একই রকম বৈকল্য ও ঔদাসীন্যের উদয় হল; সকলেই সংসার ছেড়ে যেতে চাইলেন। যজ্ঞ করে অগ্নিকৃত্য শেষ করে, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, সব সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে, বল্কল ধারণ করে তারা পরিব্রজ্যা নিলেন। পরীক্ষিৎ নাবালক, তার শিক্ষার ভার কৃপাচার্যকে দিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, এর পুত্র রাজা হবেন। ততদিন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান যুযুৎসুকে রাজত্ব করতে বললেন। সকলে বন্ধলধারণ করে সমবেত প্রজাদের নিষেধ ও রোদন উপেক্ষা করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘুরে উত্তরের দিকে এগোলেন–পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী; একটি কুকুরও পথ থেকে তাদের সঙ্গ নিল। অগ্নিদেব এসে অর্জ্জুনকে বললেন, তিনি যেন তাঁর গভীবা ধনু, যা বরুণের কাছ থেকে অর্জ্জুনের জন্যে অগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন, সেটি যেন অর্জ্জুন বরুণকে প্রত্যার্পণ করে মহাপ্রস্থানে যান। শুনে অর্জ্জুন গান্তীবা ধনুটি জলে ফেলে দিলেন।(২)

পথ চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে গেলেন দ্রৌপদী; ভীম যুধিষ্ঠিরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেই পাপে এই মৃত্যু। এর পরে নকুল–তীর প্রাজ্ঞতার অহংকারের জন্যে; সহদেব–তার রূপাভিমানের জন্যে; অর্জ্জুন— এক দিনে সব শত্রু বিনাশ করবেন। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করতে পারার জন্যে; এবং অবশেষে ভীম–তাঁর ভোজনপ্রিয়তার জন্য প্রাণ হারালেন। এক যুধিষ্ঠির ও তাঁর সঙ্গী কুকুরটি স্বর্গের দ্বারে পৌঁছতে দেবদূত কুকুরটি ফেলে রেখে যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে যেতে আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির রাজি হলেন না, বললেন নিষ্কারণে বিশ্বস্ত সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তখন দেখা গেল কুকুর স্বয়ং ধর্ম। স্বর্গে পৌঁছে যুধিষ্ঠির ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে চাইলেন।'(৩)

শেষতম পর্ব স্বর্গারোহণ। যুধিষ্ঠির প্রথমে দেখতে পেলেন কৌরব বীরদের। বিস্ময় প্রকাশ করলে নারদ বললেন যাদের পাপ বেশি পুণ্য কম, তারা আগে স্বর্গ ভোগ করে নরকে যায়। পুণ্যবান আগে নরকে যায়, তাই যুধিষ্ঠির নরকে যাতনাক্লিষ্ট ভাইদের ও

দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। যুধিষ্ঠির আসতেই নরকবাসীরা সকলে একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ করলে যেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করেন; কারণ নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা, উৎকট পুতিগন্ধ, নানা রকম উৎপীড়নের কাতরোক্তি এ সবই যুধিষ্ঠির আসা-মাত্রই থেমে গেল। আলোকময় পরিবেশ, সুগন্ধ বায়ু ও শ্রুতিসুখকর ধ্বনিতে নরকবাসীরা তাদের যন্ত্রণা ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেল। তখন নরকবাসীরা সকলে বিশেষ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করতে লাগলেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন, কারণ তিনি আসাতে তাঁদের যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে। যুধিষ্ঠির দেবদূতকে দেবতাদের জানাতে বললেন যে, তিনি ওইখানেই থাকবেন, যন্ত্রণাকাতর নরকবাসীদের আরাম দিতে। এর পর দেবতারা এসে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। পথে স্বর্গের গঙ্গায় অবগাহন করে মানবদেহ ত্যাগ করে দিব্য শরীর ধারণ করে স্বর্গে এলেন। দেখলেন, তার ভাইরা, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ সেখানে আছেন। শুনলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পরের অংশ অপ্রাসঙ্গিক–ফলশ্রুতি অংশ।(৪)

মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ অংশে বেশ কিছু ব্যাপারে পাঠকের সাড়া দ্বৈধতাকে স্পর্শ করে। মৌষল পর্বের শেষাংশে ও মহাপ্রস্থানের প্রথমাংশে দেখি, কৃষ্ণের মৃত্যু, যদুকুলধ্বংস, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনু প্রত্যপণ, ইত্যাদির মধ্যে বীরদের ক্ষত্রিয়কৃত্য যেন ফুরিয়ে গেল। নিরস্ত্র ক্ষত্রিয়ের কী পরিচয়? এখন তারা বানপ্রস্থী, কাজেই যজ্ঞকর্ম বা ক্ষত্রিকর্ম থেকে মুক্ত। কিন্তু বানপ্রস্থেও তাঁরা রইলেন না, ধীরে ধীরে হিমালয়ে আরোহণ করতে লাগলেন। প্রথমে পতন ও মৃত্যু ঘটল দ্রৌপদীর। ভীমের প্রশ্নে ধর্মপুত্রের উত্তর দ্রৌপদীর অপরাধ অর্জ্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। মনে পড়ে, দ্রুপদের রাজসভায় বীর্যশুদ্ধা দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে, হাতে সাদা ফুলের একগাছি মালা। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দেখলেন তরুণ বীর অর্জ্জুন অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করছেন, ওষ্ঠ ধরে আনন্দিত হাসি ও হাতে পুষ্পমাল্য নিয়ে শুচিস্মিতা দ্রৌপদী এগিয়ে এসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে অর্জ্জুনকে মালা পরিয়ে দিলেন। কুমারী হৃদয়ের সে মুহূর্তের আত্মনিবেদনের চরিতার্থতা, সে কি ভুলবার। দৈবদুর্বপাকে আরও চার ভাইকে পরে বরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেম যার প্রতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সে তো অর্জ্জুনই। তার দুর্ভাগ্য অর্জ্জুন পর পর অন্য তরুণীদের পাণিগ্রহণ করেন, দ্রৌপদীর সেই শুচিশুভ্র প্রেম তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। অর্জ্জুনের ওপর নিস্ফল অভিমান করেছেন, কর্তব্যে ত্রুটিছিল না। অন্য স্বামীদের প্রতি, কিন্তু প্রথম প্রেম কি শাসন মানে? অর্জ্জুনের প্রতি নিস্প্রতিদান অনুরাগ তো দ্রৌপদীর জীবনে মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে গোপনে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে–এ.কি পাপ হতে পারে? অথচ ধর্মপুত্র বললেন, এই তার পাপ। এই পাপে তাঁর মৃত্যু। লক্ষণীয়, প্রথম পতন ও মৃত্যু একমাত্র নারী অভিযাত্রিকটিরই, সে কি নারী বলেই?

যুদ্ধের মধ্যে প্রবল ক্ষোভে ও আক্রোশের মুহূর্তে অর্জ্জুন হঠকারীর মতো দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা করে বসেন–একদিনে সব শত্রু নিপাত করবেন। এ উচ্চারণে অর্জ্জুনের

তখনকার ক্রুদ্ধ আস্ফালনই ছিল। বক্তা শ্রোতা সকলেই জানত এটা সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে। এমন তো কত কথাই মানুষ তীব্র আবেগের মুখে বলে; অথচ সেই পাপে নাকি অর্জ্জুনের মৃত্যু। নকুল-সহদেবের বিজ্ঞতা ও রূপের অভিমান কখনও উদগ্ররূপে প্রকাশ পায়নি, কারও ক্ষতিও করেনি। তবু সেই মনোভাব এমন অমার্জনীয় যে সেই পাপে তাঁদের মৃত্যু ঘটল। ভীম অসামান্য বলশালী, দীর্ঘদেহী, আহারে তার প্রয়োজনও বেশি ছিল, রুচিও বেশি ছিল। স্বয়ং কুন্তি জানতেন শক্তিমান পুত্রের প্রয়োজন বেশি, তাই ভোজ্যের অর্ধাংশ ভীমের জন্যে রাখতেন, বাকিটা বাকি চার ভাইয়ের। প্রয়োজনে দৈহিক বলের জন্য সব পাণ্ডবদেরই ভীমের শরণার্থ হতে হয়েছিল। সেই মানুষটা ভোজনপ্রিয় ছিল বলে তাঁর মৃত্যু ঘটিল! অর্থাৎ তীব্র সংযম যথেষ্ট ছিল না, তিনি নিষ্কাম ভাবে আহার করতেন না। শুনলে সকলেরই মনে হয়, পাপ ও দণ্ডের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্যই এখানে নেই। শেষ পর্যন্ত একা চলেন যুধিষ্ঠির, পিছনে কুকুরটি। এটি স্বেচ্ছায় তাদের অনুগামী হয়েছিল বলে একে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে রাজি হননি যুধিষ্ঠির। এতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যদিও কুকুরটি সত্য অর্থে আশ্রিত ছিল না, শুধু অনুগামীই ছিল। তাই তাকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মৃতের সঙ্গে (অর্থাৎ মৃত ভাইদের ও দ্রৌপদীর) জীবিতের কি সম্পর্ক? কুকুরটি জীবিত শরণার্থী, একে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।(৫) তা না হয় না ত্যাগ করুন, কিন্তু সারা জীবনের সহচর ও সঙ্গিনীর সঙ্গে ক’প্রহরের ব্যবধানে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল? এই মহানুভব উচ্চারণে যুধিষ্ঠিরের শরণাগতরক্ষণের নিদর্শন থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের বিস্মৃত হওয়ার অকৃতজ্ঞতাও রয়েছে।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারে। সামান্য ভোজনবিলাসিত, প্রজ্ঞাভিমান বা রূপাভিমান, ক্রুদ্ধ মুহূর্তের অবিমুষ্যকারী প্রতিজ্ঞ, অতি স্বাভাবিক প্রেমজ পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি যদি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তা হলে স্বয়ং ধর্মপুত্রের যে স্পষ্ট মিথ্যাভাষণে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্যের প্রাণহানি ঘটেছিল সেই মিথ্যাভাষী কোন সুবাদে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছন? বলা প্রয়োজন, এই ব্যবস্থাপনা– দ্রৌপদী ও তার চার স্বামীর মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমন–এ সবই দেবতাদের, যাদের মধ্যে ধর্মও আছেন। রূপকে পাওয়া যাচ্ছে, যে কুকুরটি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেছিল, বাৎসল্যের জন্যে যাকে ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে যেতেও রাজি হননি, সে সত্যিই কুকুর নয়, স্বয়ং ধর্ম, যুধিষ্ঠিরের পিতা। এটা তাঁর ধর্মপরায়ণতা বলে গণ্য হল এবং যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের অনুগামী না দেখিয়ে মহাকাব্যকার দেখালেন ধর্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের অনুগামী। পরে আমরা দেখব, যুধিষ্ঠির নিষ্পাপ নন, কিন্তু কোনও এক স্তরে তিনি ধর্মের উন্নত শিখর স্পর্শ করেছিলেন যার দ্বারা ধর্ম তার অনুগমন করছে— এই রূপকটি যথাযথ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ধর্ম যুধিষ্ঠিরের চিরানুগামী, কারণ যুধিষ্ঠির নিজেই সতত ধর্মচারী।

এ তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পরে ব্যাপারটা একটা নতুন আলো দেখা দেয়: ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক। তা হলে, সেই প্রাণঘাতী মিথ্যাটা কি পাপ নয়? অর্জ্জুনের উত্তেজিত দম্ভোক্তি, যা শুনলেই বোঝা যায় যে এটাকে কার্যে পরিণত করা অর্জ্জুনের বা অন্য কোনও বীরেরই সাধ্য ছিল না, যা ছিল শুধু অসহিষ্ণু রোষের প্রকাশ, সেটাকেই তার প্রাণনাশী মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করছেন যিনি, তিনি স্বয়ং মারাত্মক মিথ্যা-উচ্চারণে আচার্য হন্তারক। এখানে বিচারে ন্যায় কোথায়? সমতা বা ভারসাম্য কোথায়? নেই। ওই মারাত্মক মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের ক্ষমতার সীমাও এতে নিশ্চিত হয়ে গেল: সম্মুখসমরে দ্রোণকে পরাজিত বা নিহত করতে পারতেন। না পাণ্ডববীররা–এ কথাও স্বীকৃত হয়ে রইল। অবশ্য কৃষ্ণের পরামর্শে অন্য কৌরব বীরদেরও মৃত্যু ঘটেছে অ-ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের দ্বারা। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বলা তো সজ্ঞানে করা পাপ। তা ছাড়া, শাস্ত্রে বলে মৃগয়াক্ষঃ পরীবাদঃ', ইত্যাদি আটটি অন্যায় আসক্তি হল ব্যাসন, এবং পরিত্যাজ্য। দূতক্রীড়া (অক্ষ)-ও তার মধ্যে পড়ে। অধিকন্তু, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা পণ রাখতে কে তাঁকে অধিকার দিয়েছিল? কিংবা ভাইদের পণ রাখতে? অথবা সকলের যৌথ সম্পত্তি? এই সবই অন্যায়। যখন মনে পড়ে যে, কলি-আক্রান্ত নলও দময়ন্তীকে বাজি রাখতে রাজি হননি, সেখানে দেখি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যুধিষ্ঠির পর পর এ সব অন্যায় করলেন। এখানে পাঠক কী ভাববেন? ধর্ম আর যুধিষ্ঠির অভিন্ন হলে এই কি ধর্ম? যুদ্ধান্তে গান্ধারীর কাছে যিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ওপরে নিয়েছিলেন তিনি কি তখন শুধুই ভদ্রতা করে সান্তনা দিয়েছিলেন? যে পাপ-বোধে সিংহাসনের জন্যে যুদ্ধ করেও করতলগত সিংহাসন গ্রহণ করতে পারছিলেন না সে-আত্মগ্লানি কি অভিনয় মাত্র? তা তো নয়, তিনি তো অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে রাজি হলেন সত্যকার একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতেই। কাজেই যুধিষ্ঠির একাধিক অন্যায় করেছিলেন এবং সে নিয়ে তাঁর কোনও মোহ ছিল না। তা হলে এই সশরীরে স্বর্গে পৌঁছনোর ব্যাপারটা কী? দেবতাদের ভুল? পাঠক এইখানে এসে যুধিষ্ঠিরের নিষ্পাপ ধর্মাত্মতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্পাপ ধর্মাত্মা বলেই প্রতিপন্ন করছে মহাকাব্য।

এ জায়গায় পৌঁছে পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে ধাক্কা লাগে এবং ধীরে ধীরে যে সমাধানটি পাঠকের প্রত্যয়ে উদিত হয় তা হল, যুধিষ্ঠিরের বিচার এবং বস্তুত কোনও মানুষের বিচারই একমাত্রিক হতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের একাধিক বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু কোনও একটি পরিমাপে পড়ে যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরের মর্মন্তুদ অন্তর্দ্বান্দ্বের কথা। সেদিন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে দ্বিধা ছিল না। ভিক্ষুকের মতো আচার্যদের পায়ে ধরে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রার্থনা করতে তাঁর বাধেনি। অর্জ্জুনের দ্বিধাও অর্জ্জুনের চরিত্রে নতুন এক আত্মিক মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু অর্জ্জুনের দ্বিধা স্বজনহত্যার আশঙ্কায়। সে তার পারিবারিক সত্তার আত্মীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে দ্বিধা; তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অসম্মত। কিন্তু যুধিষ্ঠির পুরো যুদ্ধ ব্যাপারটাতেই অসম্মত। মনে পড়ে,

সিংহাসনে ন্যায়সংগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে একদা সিংহাসনের দাবি প্রত্যাহার করতেও তিনি সম্মত ছিলেন। এর মধ্যে রাজকীয় গৌরব তো নেই-ই, সামাজিক এবং ধর্মগত মানদণ্ডে একটা দৈন্য ও অসম্মানও যেন নিহিত ছিল। এইখানে যুধিষ্ঠির এমন এক বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠেন যিনি ক্রান্তদর্শী। আপাত লাভ, যশ, খ্যাতি, বিজয়-সমারোহ ও রাজত্বের লোভকে ছাপিয়ে যিনি দেখতে পেয়েছেন নরহত্যা পাপ-তা সে যে কারণেই হোক না কেন। কোনও কারণেই কোনও মানুষকে বধ করায় তাঁর অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ সায় দেয় না; তাতে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম বা বীর্যধর্মের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতেও তার বাধে না। এই মনোভাবের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি আছে যুদ্ধশেষে তার আন্তরিক আত্মগ্লানি ও সিংহাসনে অনীহার। এক যুধিষ্ঠিরই সে দিনের সমাজের প্রত্যাশিত বর্ণধর্মের ওপারে মানবধর্মের শেষ বিচারে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত এইখানেই, এই বিচারদৃষ্টির মহিমাতেই, তিনি ধর্মপুত্র, যিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করার অধিকারী। মহাভারত নানা ভাবে জীবনের তুঙ্গতম শিখরে এই মানবত্বের জয়গান করেছে। করেছে বহু জটিল ঘটনা সংস্থাপনার দ্বারা, ফলে এই মহাকাব্যে সাড়া দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

রামায়ণে পত্নী-অপহীরক রাক্ষসকে বধ করার প্রয়াসে দ্বিধার অবকাশ সেই, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ক্ষত্রিধর্মের কর্তব্য পালনে দ্বিধার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেখানে একটা কর্তব্যবর্ণধর্মের আদর্শ –পালন করতে গেলে অন্য একটা বৃহত্তর কর্তব্য– মানবধর্মের নির্দেশপালন করা যায় না, সত্তার মহত্তর সংজ্ঞার নিরিখে একটা ধর্মপালনে পাপের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা,সংবেদনা এবং এক চুড়ান্ত অর্থে আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার জবাবদিহির সংকট উপস্থাপিত করে। মনে পড়ে, শান্তিপর্বে ভীষ্মের উক্তি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যুদ্ধে এই মানুষকেই রাখতে হয়, যার ওপরে কেউ নেই। কাজেই মানবজিঘাংসা যার কাছে সব থেকে বড় পাপ তার ধর্ম-বোধ ক্ষত্রিয়তার ওপরে শ্রেষ্ঠ নীতির নিরিখই শুধু মানে। মহাকাব্যকারের দৃষ্টি যে শিখরে উত্তীর্ণ পাঠককে অস্পষ্ট ভাবে হলেও সে উচ্চতা দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে হয় এ মহাকাব্যের গভীরে কোন মহত্তর ন্যায়নীতিবোধ ক্রিয়াশীল। অতএব সাড়া দিতে গিয়েও পাঠক সংকটে পড়েন এবং নিজের বোধের অন্তঃস্থলে সে সংকট অতিক্রম করে তবে মহাকাব্যের মর্মবিস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

স্বর্গারোহণ পর্বে দেখি যুধিষ্ঠির স্বর্গগঙ্গায় অবগাহন করে মর্ত্যদেহটি সেখানেই রেখে দিব্যদেহ নিয়ে উঠেছেন।’(৬) তা হলে তার বৈশিষ্ট্য শুধু মর্ত্যদেহ নিয়ে স্বর্গে পৌঁছনোতে? এই আপাতবিরোধী দুটি ঘটনার মধ্যে কবি সম্ভবত বলতে চাইছেন যুধিষ্ঠিরকেও পাপ স্পর্শ করেছিল। তাই স্ব-শরীরে তিনি স্বগে পৌঁছতে পারলেন, বাস করতে পারেন না। কিন্তু আর সকলের চেয়ে তিনি যে মাথায় বড়, সে কথাটি এর মধ্যে বিধৃত রইল। পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের অন্ত্য দৃশ্যেই নায়ক একাকী, তাই

মহাপ্রস্থানপর্বের শেষ থেকে মঞ্চে যুধিষ্ঠির একই, পাঠকের দৃষ্টি পুরোপুরি তাঁর ওপরেই নিবদ্ধ।

স্বর্গে দেবদূত দ্রৌপদীকে দেখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ইনি আসলে পদ্মা, স্বয়ং লক্ষ্মী আপনাদের পাঁচ ভাইয়ের বধুরূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'(৭) এখানে বেশ কিছু ব্যাপার গোলমেলে। ঠেকে। দ্রৌপদীর স্বামীরা ভিন্নভিন্ন দেবতার অংশে জন্মেছেন, কিন্তু তারা সবাই মানুষ এবং কেউই বিষ্ণুর অংশে জন্মাননি। তা হলে দাঁড়াল এই, যে লক্ষ্মীকে ভোগ করলেন পাঁচটি মানুষ, তাঁরা কেউই বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অংশও নন। দ্রৌপদী দ্রুপদরাজার যজ্ঞবেদী থেকে উঠেছিলেন আর লক্ষ্মীর উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। আসলে মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাদের দেবতার অংশে জন্মানোর কথা মাঝে মাঝেই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সম্পর্কে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, তা ঘটল ওই দ্রৌপদীর ওপরে লক্ষ্মীত্ব পরে আরোপিত হওয়ার জন্যে। ফলে পাঠকের মধ্যে খটকা থেকে যায়, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অংশে জন্মানো পাঁচ ভাইয়ের বধু হন কি করে? কেউ এ প্রশ্ন করেননি, কোনও উত্তরও দেওয়া হয়নি। শূন্যে প্রলম্বিত হয়ে থাকে সংশয়। মহাকাব্যের মানবিক মূল্যবোধ এতে খণ্ডিত হয় না, সামাজিক সতীত্বের প্রশ্নই শুধু অনুত্তরিত থেকে যায়। এর দ্বারা মহাকাব্যে অন্য এক মহিমা লগ্ন হয়।

স্বর্গে পৌঁছবার পর যুধিষ্ঠিরকে জানানো হল, যেহেতু তিনি ছলনার দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, সে জন্যে তীকেও ছলনার দ্বারা অল্পক্ষণের জন্য নরকদর্শন করানো হল।'(৮) আগেই বলেছি, দ্রোণের মৃত্যু ঘটানো ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের অন্য পাপ ছিল, কিন্তু শুধু এইটিরই উল্লেখ করা হল, এই পাপেই নাকি তাকে স্বল্পকাল নরকে থাকতে হয়েছিল। নিরাকদর্শনের মধ্যে তাঁর নৈতিক স্থলনের স্বীকৃতি আছে নাকি এটা মিথ্যাবচনের দ্বারা দ্রোণবধের প্রায়শ্চিত্ত? এখানে কার্যকরণের অসামঞ্জস্য পাঠককেউদ্বেলিত করে: যুধিষ্ঠির ভাইদের দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাকে নরকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি পৌঁছনোমাত্রই নরকবাসীদের সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল, নারকীয় পরিবেশ লুপ্ত হয়ে মনোরম, উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হল। তা হলে যুধিষ্ঠির এক মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু নরকভোগ করলেন না, যদিও মিথ্যাভাষণের দ্বারা আচার্যের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, 'ব্যাসন' বলে বর্ণিত জুয়া খেলেছিলেন–নিজের অপটুতা ও পরাজয়ের সম্ভাবনা জেনেও। এবং বাজি রেখে খেলে হারলেন যে সম্পত্তি তা তার একার নয়, ভাইদের বাজি রাখার অধিকার যুধিষ্ঠিরের ছিল না। কারণ তাঁরাও দ্রৌপদীর স্বামী, দ্রৌপদীকে বাজি রেখে হারবার অধিকার ছিল না, কারণ দ্রৌপদী অন্য ভাইদেরও স্ত্রী–এত সব পাপের জন্য কী প্রায়শ্চিত্ত? নরকদর্শন, যে নরক তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নরকত্ব থেকে মুক্ত হল। মুহূর্তকাল, দূর থেকে শুধু নরক দেখাতেই এত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল? এ কেমন নৈতিক বিচার? পাঠক বিমূঢ় বোধ করেন। একটিমাত্র সমাধানে ঠেকে সব জিজ্ঞাসা: যুধিষ্ঠির মানবিক নীতির মানদণ্ডে বড় মাপের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের অনিবার্য মনোভাব যে জিঘাংসা এবং তার অনিবার্য পরিণতি

যে লোকক্ষয়, বিশেষত যারা মরবে তাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যই সিংহাসনকামী নয়–এই সব নিয়ে নিরন্তর মর্মপীড়ায় দগ্ধ হয়েছেন যুধিষ্ঠির। সেই যন্ত্রাণাতেই জীবৎকালেই তার বহু পাপ ক্ষালন হয়েছিল। তাই যন্ত্রণার নরকেই তিনি আন্তর শুচিতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই নরক, তাঁর স্থান নয়।

স্বর্গ-নরক পাপ-পুণ্য নিয়ে এই অতি দুরূহ জটিল বোধ রামায়ণে কুত্রাপি নেই। সেখানে কর্তব্য অকর্তব্য অধিকাংশ স্থলেই সরলরৈখিক। যেখানে নয়, যেমন বালীকে ও শম্বককে বধ করা এবং বারবার সীতা পরিত্যাগ, সেখানে রামচন্দ্রের যন্ত্রণা নেই–একেবারে শেষে বিচ্ছেদবোধ ছাড়া, এবং সেটাও দাম্পত্য আবেগপ্রসূত, কোনও গভীর নীতির সংকট তাঁর নেই। লঙ্কায় সীতা পরিত্যাগের সময়ে রামচন্দ্র যে সব মর্মান্তিক কটুকথা সীতাকে বলেন তার ভূমিকায় ওই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা আছে হৃদয়ান্তগর্তং ভাবং প্রবক্তৃমুপচক্রমে' অর্থাৎ ওই কটুকথা রামের মনোগত ভাব; দেবতারা সীতার সতীত্ব প্রতিপাদন করবেন জেনে লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরীক্ষা করবার ছলে ওই সব বলেননি। সীতা চিতায় দেহত্যাগ করবেন। এইটে জেনেও বাধা দেননি–সীতা যে রাবণের অঙ্কশায়িনী হননি এ কথা বিশ্বাসই করতে পারেননি বলে। মনে পড়ে, উত্তরকাণ্ডে রাম অযোধ্যার সিংহাসন ভরতকে দেন, লব-কুশকে নয়; তখনও তা হলে সীতার সতীত্বে পুরো বিশ্বাস আসেনি? আর যুদ্ধ ক্ষেত্র লঙ্কায় তো অযোধ্যার প্রজা কেউ ছিল না, কাজেই প্রজার জ্ঞানের জন্য ওই সব বলেছিলেন এ কথা একেবারেই প্রণিধানযোগ্য নয়। অতএব রামের কাছে নৈতিক সংকট যতবার এসেছেএকমাত্র পিতৃসত্য রক্ষা ছাড়া এবং ভরতের অনুরোধে তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া ছাড়াসর্বত্রই রাম নৈতিক সংকটে অন্যায়কে অবলম্বন করেছেন। এবং কোথাও পাঠকের চিত্ত নৈতিক দ্বিধায় দোলাচল হয় না। রামায়ণের নৈতিক জগৎ সাদাকালোয় বিভাজিত–ধূসর বা দো-রঙা কিছু নেই।

স্বর্গারোহণের শেষ দিকে সব কৌরববীর সেনাপতি ও আচার্যরা স্বর্গে এসে গেছেন। কোনও কারণ দেখানো হয়নি; অল্পকাল স্বর্গবাস ও দীর্ঘকাল নরকবাস। তাঁদের প্রাপ্য বলে শোনা গিয়েছিল আগে, কিন্তু কার্যত দীর্ঘকাল নরকবাস তাদের করতে হয় না। কেন, তা বলা হয়নি। মনে হয়, বীর হিসেবে তেঁাদের অমান কল্প মূর্তি পাণ্ডবদেরও ওপরে; কারণ কৌরব সেনাপতিরা পাণ্ডবদের কুচক্রে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এইখানে কৌরবদের একটা নৈতিক জিৎ রয়ে গেল, যা পাণ্ডবরা অর্জন করতে পারেননি। কৃষ্ণের পরামর্শে উদ্যোগপর্বে উভয়পক্ষে স্বীকৃত শর্তগুলি পাণ্ডবরা নির্বিচারে পদদলিত করেছেন। কৌরবরা যুদ্ধকালে সে রকম অন্যায় করেননি। অভিমন্যুবধের উল্টোদিকে ঘটোৎকচ বধ আছে। কোনও একটা জায়গায় কৌরবরা বীর্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হননি বলে বীরের স্বর্গ থেকে তাঁদের বিচ্যুত হতে হয়নি। হিসেবটি খুবই সূক্ষ্ম, বহুমুখীন এবং বহুধাব্যাপ্ত। ভাবতে হয়, মননে, সংবেদনে স্থির হয়ে গ্রহণ

করতে হয়; না হলে আপাত বৈষম্য দুর্লঙ্ঘ্য থেকে যায়। এত আয়াস কোনও রামায়ণ-পাঠককে করতে হয় না।

শেষ অংশে দু'বার বলা হয়েছে: 'রাজাদের নরক দর্শন করতেই হয়';(৯) কোনও কারণ দেখানো হয়নি। প্রশ্নটার বোধহয় দুটো সমাধান আছে। প্রথমত, রাজা বিজিগীষু বা বিজয়কামী হলে যুদ্ধ করতেই হবে, এবং রাজ্য-বিস্তারের জন্যে যে যুদ্ধ, তাতে নিরপরাধের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা এবং নিরপরাধের প্রাণহানি অনিবার্য; সে পাপ রাজাকে স্পর্শ করেই। আর রাজা যদি বিজিগীষু নাও হন, তবু শাসন করতে গেলেই দণ্ড বিধান করতেই হয় এবং তার মধ্যে নিরাপরাধের দণ্ডিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। যদি অপরাধীরই দণ্ডবিধান হয়, তবু তার মধ্যে কিছু নিষ্ঠুরতা থাকেই, সে পাপও রাজাকে স্পর্শ করে। এ ছাড়া চরবৃত্তির ছলনা, প্রয়োজনে নিরপরাধকে প্রতারণা করে ইষ্টসিদ্ধি করা এ সবের পাপিও আছে। এ সব বোঝা গেলেও প্রশ্ন থাকে যে, এ ধরনের আচরণ তো অর্থনীতি ও রাজনীতি-সম্মত, এতে পাপ কোথায় যে রাজাকে নীতিসঙ্গত আচরণ করেও নিরাকদর্শন করতে হবে? আবার তাই মহাভারতের ভিত্তিভূমি যে নীতিসংকট, ধর্মসংকট সেইখানেই পৌঁছে যেতে হল। এ সংকট রাজধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের। ব্যবহারিক জগতে এর কোনও সমাধান নেই; তাই একটা কল্পিত চুড়ান্ত রায় দেওয়া হল: একটা ধর্মের নীতির সঙ্গে অন্য ধর্ম বা নীতির সংঘাতে শেষ পর্যন্ত মহত্তর নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার। তাই আপেক্ষিত ক্ষত্রিয়ধর্মেরাজধর্ম পালন করেও মানুষ শেষ মানবিক বিচারে দণ্ডিত হতে পারে। এসবের উপস্থাপনা ওই মানবধর্মের চূড়ান্ত জয় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে। মহাভারতে এ উদ্দেশ্য যতটা উন্ধের্ব অধিষ্ঠিত, তার জয়ের স্থাপনাও ততটাই উধের্ব। এবং এ-তত্ত্বকে প্রণিধান করতে গেলে বহু অভ্যস্ত নীতির স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। এই কারণেই পাঠকের কাছে মহাভারতের দাবি এত বেশি জটিল, এত মমর্যন্ত্রণায় তার উপলব্ধি; শুধু মাত্র বোধে নয়, বোধিতে। সহজেই অনুমান করা যায়, এই আয়াস-সাধ্য জীবনবোধের অন্বেষা সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে, নিরুৎসুক করবে; ফলে মহাভারতে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে দুঃখসাধ্য হয়ে উঠবে কাজেই, জনপ্রিয়তার ভিত্তি এখানে নেই। অনেক সহজে সাড়া দেওয়া যায় রামায়ণে– পাঠককে তা ব্যাকুল, মর্মপীড়াগ্রস্ত বা বিমূঢ় করে না। তাই বলা হয়েছে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম, রামের মতো আচরণ করতে হবে। সেখানে মহাভারত বলছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, এবং এই সুদীর্ঘ মহাকাব্যটি জুড়ে সেই মানুষের সংজ্ঞানিরূপণ করা হয়েছে, নৈতিক মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে।

মহাভারত স্রষ্টার অন্তর্দ্বন্দ্ব

মহাভারতে আপাত-নিষ্ক্রিয় এক সন্ন্যাসীর মতো চরিত্র হলেন ভীষ্ম! মনুষ্যজন্মের পূর্বে ইনি স্বর্গের অষ্ট বসুর অন্যতম দ্যু-নামের বসু ছিলেন। ভাইদের একদিন ইনি বশিষ্ঠের কামধেনু চুরি করার প্ররোচনা দেন। বশিষ্ঠ প্রথমে সকলকেই শাপ দেন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার; পরে সেটা প্রত্যাহার করে শুধু দু-কেই শাপ দেন। এই শাপে বসুরা গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মান। গঙ্গা জন্মমাত্রেই প্রথম সাতটি পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করেন। পূর্ব-শর্ত মতো শান্তনু প্রতিবাদ করেননি; কিন্তু অষ্টম সন্তানের বেলা প্রতিবাদ করতেই গঙ্গা সন্তানটিকে নিয়ে শান্তনুকে ত্যাগ করে যান। গঙ্গা এই পুত্রের নাম দেন দেবব্রত এবং বশিষ্ঠ ও গঙ্গা একে শিক্ষিত করে তোলেন। বত্রিশ বছর পরে একদিন শান্তনু দেখেন এক কুমার বাণবর্ষণে নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করছেন; রাজার সন্দেহ হতে গঙ্গাকে স্মরণ করতেই তিনি এসে পুত্রকে প্রত্যার্পণ করেন ও জানান যে পুত্রটির কোনও সন্তান হবে না এবং তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবেন।(১) রাজা দেবব্রতকে নিয়ে এসে যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন। চার বছর পর দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীকে দেখে শান্তনু আসক্ত হলেন। কিন্তু দাশরাজ শর্ত করেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিতে হবে। পিতার বিমর্ষতার কারণ জানতে পেরে, দেবব্রত দাশরাজের কাছে ও শান্তনুর কাছে অঙ্গীকার করেন যে তিনি চিরকুমার থাকবেন, রাজ্য নেবেন না। এর পরিবর্তে তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভের বর প্রার্থনা করেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হয়ে, তাকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও দেন।(২) এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যে তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। কিছু দিন পরে তিনি ঋষি পুলস্ত্যর কাছে তীর্থমাহাত্ম্য শুনে তীর্থে যান।

রত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্ম তাঁকে তখন কোনও রকমে সাহায্য করেননি; চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন।'(৩) স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভীষ্ম অনুজের বিপদে উদাসীন রইলেন কেন? এর একটা উত্তর হল ঔদাসীন্য ভীষ্ম চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। যিনি পিতার দাম্পত্যসুখের ব্যবস্থা করতে নিজের দাম্পত্য সম্ভাবনা রহিত করে দিলেন তাঁর চরিত্রে শৌর্য ছিল না–এ কথা বলা চলে না। অথচ গন্ধর্বদের হাতে ভ্রাতার মৃত্যু ঘটলেও তিনি ক্ষত্রিয় নীতি অনুসারে তার কোনও প্রতিশোধ নেননি; এটি কতকটা স্ববিরোধী আচরণ। বিচিত্রবীর্য রাজা হলে সত্যবতীর সাহায্যে ভীষ্মই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য চালনা করতেন যদিও নিজে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু সুখবিলাসটা ভোগ করেননি। মনে পড়ে রামচন্দ্রের কথা–পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বনে আসবার পর তাকে আর একবার প্রলোভিত করা হয়, যখন ভরত এসে তাকে রাজ্য নিবেদন করেন; রামচন্দ্র সংকল্পে অবিচল ছিলেন। কিন্তু ভীষ্মকে বারে বারে প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। রামচন্দ্রের মতো তীরও জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সিংহাসনে অধিকার ছিল, কিন্তু পিতার দাম্পত্য সুখের জন্য তা অনায়াসে ত্যাগ করলেন। কিন্তু ভীষ্মের ত্যাগ শুধু সিংহাসন নয়, দাম্পত্য জীবন, সন্তান সব কিছুই। দু-পুরুষের সুখ সম্ভাবনা তিনি ত্যাগ করলেন পিতার সুখের জন্যে। সে তুলনায় রামচন্দ্র বনবাসে সীতার সাহচর্য ও লক্ষ্মণের সেবা সবই পেয়েছিলেন, এবং চতুর্দশ বৎসরের পরে সিংহাসনও ফিরে পেয়েছিলেন।

অম্বা যখন ভীষ্মকে বললেন যে তিনি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন তখন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পৌঁছে দিলেন।'(৪) এ আচরণের মধ্যে রাজপুত্রসুলভ সৌজন্য ও ক্ষত্রিয়-সুলভ ন্যায়বোধ প্রকাশ পেয়েছে। শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরশুরাম বলেন ভীষ্মের উচিত অম্বাকে বিবাহ করা। আবার সেই প্রলোভনী; কৌমার্যব্রত থেকে স্খলিত হওয়ার নির্দেশ, কিন্তু অবিচলিত ভীষ্ম তেইশ দিন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন। এখানেও ওই নির্লিপ্ত ঋষিকল্প মানুষটির ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী এবং প্রজারা ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করে আপদ্ধর্মনীতি অনুসারে সংসার-ধর্ম পালন করতে বলেন; আবার সেই প্রলোভন এবং আবার নির্দ্বিধায় প্রলোভন জয়। এখানে স্মরণ করতে হবে, শাস্ত্র এবং দেশাচারের নির্দেশ ছিল অপুত্রক জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুদের বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করবেন। কিন্তু ভীষ্মের কাছে শাস্ত্রনির্দেশের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের অঙ্গীকারের কাছে খাঁটি থাকা।

অবশেষে বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মলেন এবং তাঁদের দু'জনের একশো পাঁচ পুত্রের অস্ত্রশিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ভীষ্ম একই বহন করেন।'(৫) পরে যথাক্রমে দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করেন রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য; অর্থাৎ পিতামহের কর্তব্য তিনি অনেকটাই করেছিলেন এবং এই রাজকুমারদের সুবাদেই মহাকাব্যে তাঁর পরিচিতি। 'পিতামহ ভীষ্ম' হিসেবে। এর পর তিনি পিতামহের ভূমিকায় আসীন। জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে ভেবে এই ক্ষত্রিয়বীর অশ্রুপাতও করেছিলেন।'(৬) সেখানে তিনি নেহাৎই স্নেহাতুর পিতামহ।

ভীষ্মের শৌর্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। সেখানে ভীষ্ম কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথির অর্ঘ্য দেওয়ার প্রস্তাব করলে শিশুপাল ভীষ্মকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে; ক্রুদ্ধ ভীষ্ম প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময়ে বহু কটুকথার সঙ্গে এও বলেন যে, শিশুপাল ও তার দলের লোকদের মস্তকে তিনি পদাঘাত করবেন।'(৭) কৌরবপক্ষীয় হয়েও ভীষ্ম বারে বারেই দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে মিত্রতা করতে। ভীষ্মের চরিত্রের দুর্বলতম দুটি অধ্যায় হল, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও লাঞ্ছনা নিস্প্রতিবাদে বসে দেখা। এটি ক্ষত্রিয় ধর্মে অপরাধ; দুর্বল, আক্রান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর রক্ষণ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য-কর্তব্য। এর পরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে যখন চর এসে বলে যে পাণ্ডবরা নিরুদ্দিষ্ট, তখন কৌরবদের কী করণীয় সে বিষয়ে যে পরামর্শসভা বসে সেখানে উপস্থিত থেকেও ভীষ্ম নীরব ছিলেন, কোনও পরামর্শই দেননি। কৃষ্ণ যখন কৌরবরাজ-সভায় পাণ্ডব পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব আনেন। তখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দি করতে চাইলে ভীষ্ম বাধা দেন, কেন না

দূত অবধ্য।’(৮) কিন্তু তাঁর এ কাজটি পাণ্ডবদের অনুকূলেই যায়, যেমন আরও অনেক অন্য কাজও কৌরব-স্বার্থবিরোধী ছিল।

যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির ছুটে এসে ভীষ্মের পায়ে পড়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে মিনতি করলেন। ভীষ্ম উত্তর দিলেন: ‘মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কখনও মানুষের দাস নয়। এ কথা সত্য, মহারাজ, অর্থের জন্যেই আমি কৌরবপক্ষে আবদ্ধ। তাই এখন কীবের মতো বলছি যুধিষ্ঠির, এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।(৯) এখানে সবচেয়ে মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি হল, ‘অর্থের জন্যে আমি কৌরবপক্ষে বাধা পড়ে আছি, আমি কৌরবদের অন্নদাস, তাই ন্যায় হোক অন্যায় হোক। ওই পক্ষেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।’ নিজেই বলছেন কীবের মতো বলছি।’ অর্থাৎ ভীষ্ম সচেতন যে, ক্ষত্রিয়োচিত নয়, এ সিদ্ধান্ত দাসোচিত। ভীষ্ম কৌরব পাণ্ডব উভয়েরই প্রথম শাস্ত্রগুরু। আচার্য যেখানে শিষ্যদের শিক্ষা দেন, সেখানে তাঁর তো দাবিই থাকে ভরণপোষণে। সে দাবি তার প্রদত্ত শিক্ষার বিনিময়ে, ঘটনাচক্রে এ ভরণপোষণ তাকে নিতে হয়েছিল কৌরবদের ভাণ্ডার থেকে; কিন্তু এতে তার ঋণ থাকবে কেন? তিনি যোগ্যতা ও পরিশ্রমের দ্বারা যা অর্জন করেছেন সে সম্বন্ধেও এই দীন উচ্চারণ, এটা পাঠককে দ্বিধায় ফেলে। বিশেষ করে এই কারণে যে, এই কল্পিত ঋণ তিনি শোধ করেছেন সজ্ঞানে অন্যায় সমরে যুদ্ধ করে। তাঁর দ্বিতীয় পাপ দেহে-মনে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদ হয়ে দুর্যোধনের ওই নারকীয় পাপ–প্রকাশ্য রাজসভায় রাজকুলবধুর নির্মম অবমাননা–তা নীরবে সহ্য করা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্নগ্রহণ করা ভীষ্মের নিজের বিবেকের কাছে তার আদিম ও অন্তিম অপরাধ, তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। আপনি বিবেককেই বধ করে। যুদ্ধে কৌরবপক্ষের প্রথমে সেনাপতি হওয়া এরই অনিবার্য পরিণতি। যুযুৎসু বা বিদুর কৌরবের অন্নপালিত হয়েও বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ভীষ্ম সে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেননি।

ভীষ্মের চরিত্রে এ দ্বিধা একান্তই মৌলিক ও নিরতিশয় জটিল। কৌরবকুল প্রধান ও সৈন্যধক্ষ্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পাণ্ডবদের তিনি বধ করবেন না; প্রত্যহ দশ হাজার সৈন্য ও এক হাজার রথ বিনষ্ট করবেন। কিন্তু পাণ্ডবদের আঘাত করবেন না।(১০) নবম দিনের রাত্রে ইচ্ছামৃত্যু-বরে অবধ্য ভীষ্মকে বধ না করতে পেরে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন পাণ্ডবরা ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলে তিনি অর্জ্জুনকে বলেন, শিখণ্ডীকে রথের সামনে রাখতে। এটিও সেনাপতির অকর্তব্য। পরদিন, যুদ্ধের দশম দিনে তিনি দশ হাজার হাতি, অযুত রথারোহী সৈন্য ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে বধ করেন, কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতি করেননি।(১১) সে-জন্মে শিখণ্ডী পূর্ণ পুরুষ জেনেও পূর্বজন্মে তার নারীত্বের সুবাদে ভীষ্ম অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে শরনিক্ষেপ করলেন না। দুর্যোধনের দুর্বাক্যে মর্মাহত হয়ে একবার অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হলে কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে অর্জ্জুনকে বাঁচান। সেদিনই সূর্যাস্তের আগে সমস্ত দেহে অর্জ্জুনের শরে জর্জরিত অবস্থায় ভীষ্ম রথ

থেকে পড়ে যান। অর্জ্জুন বাণ দিয়ে তাঁর উপাধান নির্মাণ করেন এবং ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে শরনিক্ষেপ করে ভূগর্ভ থেকে প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন যা ভীষ্মের ওষ্ঠের সামনে জলধারা বর্ষণ করে। ওই শরশয্যায় ভীষ্ম আটান্ন দিন কাটান, তার পরে সূর্য উত্তরায়ণে গেলে নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।(১২) মৃত্যুর পূর্বে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে উপদেশ দেন।

লক্ষ্য করলে দেখি, ভীষ্মচরিত্রটি সাংঘাতিক ভাবে দ্বিধাখণ্ডিত। কৌরবের আশ্রয়ে থেকে কৌরবদের পক্ষেই যুদ্ধ করবেন, এটা বোঝা যায়। কিন্তু কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করে পদে পদে কৌরব-স্বার্থের হানি ঘটবেন। এইটেই সেই মৌলিক দ্বিধার প্রকাশ। প্রথমত, দ্রৌপদীর অপমান নিস্প্রতিবাদে সহ্য করাই বীর্যধর্ম থেকে বিচ্যুতি; তার পরে বারবার দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলা তো কৌরবদের বিরুদ্ধাচরণই। যুদ্ধে কোনও মতেই পাণ্ডবদের কোনও ক্ষতি না করা সেনাপতির কর্তব্যে প্রবল ত্রুটি, কৌরবদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ এই মানুষটি শান্তিকামী যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তিনি কৌরবদের কাছে ঋণবদ্ধ। এই কি তাঁর ঋণশোধ? যুদ্ধে যিনি অপ্রতিদ্বন্দী বীর, নিজের ইচ্ছা না হলে যাঁকে বধ করা যাবে না তেমন সেনাপতি তার দীর্ঘতম সৈনাপত্যের দশ দিনে অজস্র সৈনিক, রথারূঢ় ও পদাতিককে বিনষ্ট করলেন, কিন্তু মুখ্য প্রতিদ্বন্দী পাণ্ডব ভ্রাতাদের কোনও ক্ষতিই করলেন না। সেনাপতি হিসেবে এ তো চরম অধর্ম।

সরলরৈখিক ভাবে নিরসন করেছিলেন। রামের পক্ষে যোগ দেওয়া তার রাক্ষসজন্ম এবং রাজভ্রাতার কর্তব্যের নিরিখে কৃতঘ্নতা; কিন্তু তিনি সরাসরি পক্ষত্যাগ করেছিলেন। রাবণ অন্যায়কারী, পরাস্ত্রী-অপহারক, অতএব তার স্বপক্ষে থাকা অন্যায়। তাই তিনি রামের শরণাগত হয়ে অনুমতি চেয়ে নিলেন তার পক্ষেই যুদ্ধ করার। এর পরে আর একবারও পিছনে ফিরে চাইলেন না, দ্বিধাগ্রস্তের মতো কোনও আচরণই করেননি। সে তুলনায়, ভীষ্মের চরিত্রে এবং কাজে সাড়া দেওয়া পাঠকের পক্ষে অনেক বেশি দুরূহ, কারণ ভীষ্ম পদে পদে বিবেক এবং অন্নদাসের কৃত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব জর্জরিত। প্রভূত সংখ্যায় রথী, রথ ও পদাতিককে প্রত্যহ বধ করবেন, কিন্তু সেনাপতির যা মুখ্য করণীয়–প্রতিপক্ষের প্রধান বীরদের ধরাশায়ী করাযা তার সাধ্যের মধ্যেই ছিল, তা তিনি ভুলেও করতে উদ্যত হলেন না। এর মধ্যে খুব মোটা দাগের একটা বিশ্বাস হনন আছে। পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধন করা, ধ্বংসসাধন করাই যে-যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই যুদ্ধে ভীষ্ম অন্ন-ঋণ শোধ করতে সৈন্যপত্য গ্রহণ করলেন, অথচ সেনাপতির প্রধান কর্তব্যে সম্পূর্ণ বিমুখ রইলেন। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, সেনাপতির কর্তব্য, অন্নদাসের কর্তব্য, এ সবই ভীষ্ম জানতেন। কিন্তু তার সঙ্গে তার বিবেকের অন্তঃস্থলে বিরোধ জাগোল প্রকৃত মানবধর্মের প্রতি কর্তব্য। সেখানে তিনি অনুক্ষণ অবহিত যে কৌরবরা, যারা দ্রৌপদীর অন্যায় অপমানের দ্বারা গভীর ভাবে কলঙ্কিত, তাদের পরাজয়ই বাঞ্ছনীয়। এই বোধ তাকে নিয়ে গেল সেই দুঃসহ নরকযন্ত্রণার মধ্যে যেখানে

পরস্পরবিরোধী দুটি কর্তব্যের মধ্যে কোনও আপোস নেই। তাই ভীষ্ম মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে দশম দিনে অস্ত্র ত্যাগ করে অর্জ্জুনের শরধারা সমস্ত অঙ্গ পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন: 'যেমন করে উষ্ণার্ত জন গ্রীষ্মের প্রখর দাবিদাহের পর প্রথম বারিধারা সর্বাঙ্গে গ্রহণ করে।'(১৩) মৃত্যু আসছে এবার মুক্তির রূপ ধরে।

হয়তো এই অনুক্ষণ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগই তাঁকে অধিকার দিয়েছিল সুদীর্ঘ শান্তিপর্বের মোক্ষাধর্ম, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও তীর্থধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার। বোঝা কঠিন নয়, এই বিপুল উপদেশমালা প্রক্ষিপ্ত; তৎকালীন সমাজ ও যুগোপযোগী কিছু কিছু নীতি ও ধর্মের কথা মহাভারত স্থায়ী ভাবে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই কৃত্রিম ভাবে ভীষ্মের শরশয্যানির্মাণ, পানীয় জল ও মস্তকের উপাধান রচনা, কৃষ্ণের বরে আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধের বাক-শক্তিলাভ ও আটান্ন দিন ধরে উপদেশবর্ষণ। যুদ্ধের প্রাকৃক্ষণে সুদীর্ঘ ভগবদগীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত, মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভীষ্মের এই সুদীর্ঘ উপদেশবাণীও তেমনই প্রক্ষিপ্ত। হয়তো বীজাকারে অল্প কিছু উপদেশ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তিপর্ব তাঁকে যে-রূপে উপস্থাপিত করছে স্পষ্টতই তা কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। কিন্তু যেটা লক্ষ করার বিষয় তা হল, মহাভারতকার ভীষ্মকে উপদেশ দেওয়ার অধিকারী বলে বিবেচনা করেছেন। এ কথা ভুললে চলে না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনের সব পর্বে আচরণীয় নীতি সম্বন্ধে যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সংসারত্যাগী ঋষি। এক অর্থে ধর্ম, অর্থ, কাম, রাজধর্ম, বর্নাশ্রমধর্ম, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পক্ষে তারা অনধিকারী। কারণ, তারা সংসারের বাইরেই জীবনযাপন করেছেন, ফলে, এ সব বিষয়ে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জড়িত মানুষ নির্লিপ্ত ভাবে এ সব বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না, যেহেতু জড়িত থাকায় তাদের দৃষ্টি আবিল-নির্মোহ নয়। তাই দূর থেকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পারেন যে-মানুষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ তাদেরই শাস্ত্রকার আচার্যের আসনে বসিয়েছে। তাই শান্তিপর্বের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত হলেও সংসার জীবন, রাজত্ব, মানসিকতা, আতিথ্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলার গৌরব ভীষ্মকে দেওয়া হয়েছে এবং এ গৌরবের অন্যতম সত্য এক উৎস হল, তাঁর নিরন্তর যন্ত্রণাভোগ।

চিরকুমার, এক অর্থে অ-সংসারী, এই ঋষিকল্প মানুষটি ক্ষত্রিয়ধর্মের কাছ থেকে পলাতক, সেনাপতির কর্তব্যে বিশ্বাসহন্তা, কৌরবদের অন্ন-ঋণ শোধ করছেন গোপনে তাদের বঞ্চনা করে, এই সব পরস্পরবিরোধী কৃত্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। চিত্তের গোপনে একটি ক্রুর, দুঃসহ আততি বহন করেছেন দীর্ঘকাল। যে মানুষ পিতাকে সুখী করবার জন্যে অনায়াসে আমরণ জীবনের অপূর্ণতা, অতৃপ্তি বরণ করেছেন, এবং তা বহন করেছেন অনায়াসে বারংবার প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সেই মানুষই ক্ষত্রিয়ধর্ম, কৌরবদের প্রতি আনুগত্য, বীরকৃত্য ও সৈনাপত্য কর্তব্য থেকে কি গভীর ভাবে স্খলিত! প্রথম ত্যাগটা ছিল ব্যক্তিজীবনের সুখ বিসর্জন দেওয়া, সেটা তিনি

সহজে পেরেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়টার মধ্যে জীবনের গভীরতর তাৎপর্যের কাছে খাঁটি থাকার প্রশ্ন ছিল। এর সমাধান সহজ হয়নি, এটি আদর্শের প্রশ্ন, ধর্ম-রক্ষার প্রশ্ন। এর মূল্য প্রতি পদে, প্রত্যেক অবস্থাচক্রে স্বতন্ত্র ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিতে হয় মর্মমূলে অবিরত রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করার এবং তার মধ্যে দিয়ে ধর্মনিরূপণ করে চলাই ভীষ্মকে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইচ্ছামৃত্যু সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে ততটা যুক্ত ছিল না। যতটা ছিল দশম দিনে পরস্পরবিরোধী কৃত্যের সমাধানে ক্ষতবিক্ষতচিত্ত বৃদ্ধের জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত, যথার্থ অনীহা জাগার লগ্নের সঙ্গে। অন্তরে শেষ বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে জীবনের কাছে ঋণমুক্ত বলে দাবি করতে পারলেন, জীবিত থাকার দায় থেকে মুক্তি পেলেন–নিজেরই কাছে।

মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ও তার পুত্র শুকের বিবরণ আছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।(১৪) দেবীভাগবত পুরাণে পড়ি ঋষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন–জন্মক্ষণেই পিতামাতার আশ্রয়চুত। তিনি হিমালয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। একবার দেখতে পান কলবিঙ্ক পক্ষী দম্পতি তাদের শাবকদের খাওয়াচ্ছে। দেখে তার অপত্যলাভের বাসনা হয়; কিন্তু স্ত্রী নেই, কী করে সন্তান পাবেন তাই ভাবতে থাকেন। সেই সময় অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত হন, সেই স্খলিত বীর্য থেকে পুত্র শুকের জন্ম। শুক বৃহস্পতির কাছে বিদ্যালাভ করেন, পিতার কাছে আসেন এবং বিবাহ করে পিতার সঙ্গেই বাস করেন। কিন্তু এক সময়ে তপস্যা করতে করতে সশরীরে আকাশে উঠে যান। ব্যাস খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি মাত্র শুনতে পান, শুককে আর পান না। তখন শিব এসে সান্ত্বনা দিলে ব্যাস আশ্রমে ফিরে যান। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাস পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, স্ত্রী কিছুই পাননি। অলৌকিক ভাবে এক পুত্র লাভ করেন, সে তার বিবাহোত্তর জীবনে কিছুকাল পিতার সঙ্গে বাস করে, কিন্তু কিছুকাল পরে ব্যাস তাকেও হারান।

মহাভারতে ব্যাসের মাতা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য দুই ভাই জন্মায়। তাদের সঙ্গে ব্যাসের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। সত্যবতীকে বলেছিলেন, তিনি স্মরণ করলে ব্যাস উপস্থিত হবেন। হলেন যখন চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য মৃত এবং দুই বিধবা অম্বিকা অম্বালিকার কোনও পুত্র নেই। হস্তিনাপুর সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হবেন সত্যবতীর পুত্র–রাজমাতা হওয়ার এই উদগ্র কামনায় শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সন্তান গঙ্গার পুত্র দেবব্রতকে নির্মম ভাবে বঞ্চিত করেন, কঠোর চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন ভীষ্ম। কিন্তু তার দুই পুত্রেরই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে, অতএব যে সন্তানকে জন্মক্ষণে বিসর্জন দিয়েছিলেন এই একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকেই স্মরণ করলেন সত্যবতী। তাপস ব্যাস দেখা দিতে সত্যবতী বললেন ভ্রাতৃবধু দুটিতে পুত্র উৎপাদন করতে। এ নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু ব্যাস জানতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কুৎসিত আকৃতি বিকর্ষণ ঘটাবে ওই রাজবধু দুটির চিত্তের।

তাই সত্যবতীকে বললেন, তারা যেন এক বৎসর শুচিব্রতা হয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যবতী বিলম্বে অসম্মত, তখন ব্যাস ঘৃণার্থ, অবাঞ্ছিত পুরুষরূপে দুটি নারীর গর্ভাধান ঘটালেন। পরে এক দাসী তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। জন্ম হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, বিবর্ণ পাণ্ডু এবং শান্ত, দান্ত ধার্মিক বিদুরের।

কলবিষ্ক শাবকদের প্রতি মা-পাখি বাবা-পাখির অপত্যস্নেহের প্রকাশ দেখে যার অপত্যবাসনা জাগে তিনি বিনা দাম্পত্যে অপত্যের জনক হলেন; অলৌকিক ভাবে শুকের এবং দুই অনিচ্ছুক রমণীর ও একটি নম্রমধুর দাসীর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের সংযোগে। পত্নীপ্রেম তাঁর ভাগ্যে জোটেটি; পুত্র শুকের দাম্পত্য জীবন কাছে থেকে কিছুকাল দেখেছিলেন মাত্র, তা সে শুককেও অকালে হারালেন।

গান্ধারী যখন একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং কুন্তির পুত্রভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হয়ে সে পিণ্ডটিকে নষ্ট করতে উদ্যত হন তখন ব্যাস সেটিকে একশত এক খণ্ডে ভাগ করে শত কৌরব পুত্র ও কন্যা দুঃশলার ভ্রূণে বিন্যস্ত করেন। নিজে অপত্নীক। কলবিষ্ক শাবকদের দেখার পর থেকে অপত্যস্নেহ তিনি ইতস্তত বিতরণ করেছিলেন। মেহমমতা তার সহজাত বৃত্তিই ছিল। পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণের পরে ব্যাস এসে কুন্তিকে সান্ত্বনা দেন। বনবাসকালে পাণ্ডবদের একচক্র নগরীতে বাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং দ্রৌপদী-স্বয়ং বরে যাওয়ার জন্যে তাদের পরামর্শ দেন।(১৫) যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ব্যাস উপস্থিত থাকতেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হলে পর যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।(১৬) পাণ্ডবদের বনবাসকালে যখন দুর্যোধন পক্ষ তাদের বিনাশে বদ্ধপরিকর, তখন ব্যাসই দুর্যোধনদের নিরস্ত করেন।(১৭) যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ধারাবিবরণী শোনাবার জন্যে তিনিই সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দেন।(১৮) ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত, তখন ব্যাস এসে কিছুক্ষণ ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করে যান।(১৯) যুদ্ধে এক সময় যুধিষ্ঠির খুব উদভ্রান্ত বোধ করলে ব্যাস এসে তাঁকে নানা সান্তনাবাণী শোনান। যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য যখন প্রচুর বিত্তের প্রয়োজন হল; তখন ব্যাসই এসে রাজা মরুত্তের গোপন বিত্তরাশির সন্ধান দেন।(২০)

ঘটোৎকচের মৃত্যুর সংবাদে যুধিষ্ঠির যখন নিরতিশয় ব্যাকুল, তখনও ব্যাস এসে যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে আশ্বস্ত করেন। স্ত্রীপর্বে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী সকল পাণ্ডবকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হলে ব্যাস এসে তাকে নিরস্ত করেন।(২১) যুদ্ধান্তে যে পাপবোধে যুধিষ্ঠির ভারাক্রান্ত বোধ করছিলেন তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ব্যাসই যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপনাশ করার পরামর্শ দেন।(২২) ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি, ও বিদুর যখন বনগমনে উদ্যত, তখনও ব্যাস এসে তাদের সান্তনা ও আশ্বাস দেন।(২৩) অলৌকিক শক্তির প্রয়োগে সমস্ত মৃত সৈনিকদের এক রাতের জন্যে পরলোক থেকে মর্তে নিয়ে আসেন ও বহু ক্ষত্রিয় নারী তখন গঙ্গায় প্রাণত্যাগ

করে স্বামীদের সান্নিধ্যে চলে যান।(২৪) যদুবংশ যখন ধ্বংস হচ্ছিল তখন অর্জ্জুন ব্যাসের কাছেই আসেন কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে।(২৫) অনুশাসন পর্বে দেখি একটি কীট শকটের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিল, ব্যাস তাকে বাঁচান ও সে পরজন্মে। ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। জীবের প্রতি মমতা ব্যাসের সহজাত বৃত্তি এবং মহাকাব্য রচয়িতার পক্ষে এটি যে একটি অপরিহার্য গুণ তা দেখবার জন্যেই যেন এ ঘটনার উল্লেখ। শেষ জীবনে ব্যাস আবার তার প্রথম সাধনস্থান হিমালয়েই ফিরে যান এবং তপস্যায় মগ্ন হন। ব্যাসের মৃত্যুর কথা শাস্ত্রে লেখে না।

চারটি বেদের বিভাজন, সমস্ত মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচনা ব্যাসেরই কৃতি— এ কথা বলা হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনও একজন মানুষকে এতগুলি কাজ করতে হলে তাকে প্রায় আড়াই হাজার বছর বেঁচে থাকতে হয়, এবং ব্যাস যে তেমনই বেঁচে ছিলেন তার কোনও উল্লেখ কোথাও নেই। তা হলে দাঁড়ায়, ব্যাস একটি সংজ্ঞা মাত্র, যিনি বেদভাগ না করলেও মহাভারতের রচয়িতা বলে তাঁকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমরা জানি, মহাভারত মূল রচনা ও অন্তত দু-তিনটি প্রক্ষিপ্ত অংশের সংকলনে নির্মিত, এর শেষতম রূপায়ণের সঙ্গেই রচয়িতা হিসেবে ব্যাসের যোগ। বেদ এবং পুরাণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব, যদি না বেদবিভাজন ব্যাপারটি মহাভারতের সমকালীন হয়ে থাকে।

এতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা বলে ব্যাসকে চিহ্নিত করবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট; তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকের শ্রদ্ধা জাগানো। মহাভারত পড়ে পাঠক শ্রদ্ধায় অভিভূত হন, কিন্তু সে শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর প্রজ্ঞায়, তাঁর ভূয়োদর্শিতায়। পাঠকের এই ব্যাপারে একটা দ্বিধা থেকে যায়: যে মানুষটি বিবাহ করেননি, সংসারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁর পুত্র শুকের সংসার মাত্র কিছুকালের জন্যে কাছ থেকে দেখা, যিনি রাজপ্রাসাদে থেকে মূলত অসম্পৃক্ত, কেননা ব্যক্তিগত কোনও বন্ধনই তার ছিল না, তিনি কেমন করে জীবনের এত বৈচিত্রের সন্ধান দিলেন? মহাভারত নিজের সম্বন্ধে বলেছে, যা এখানে নেই তা কোথাওই নেই।’(২৬) এ কথা বহু দূর পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কিন্তু ব্যাস কেমন করে এত গভীর এবং এত ব্যাপক ভাবে জীবনকে জানলেন? তিনি শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন বার বার, এমনকী শোকে আপ্‌লুত হয়ে অশ্রুপাতও করেছেন, পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করে পরামর্শ দিয়েছেন বারে বারে, কৌরবদের বলেছেন সর্বনাশের পথে না গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে। অর্থাৎ তিনি কৌরব-পাণ্ডবদের ভাগ্যভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু এগুলি তা মানবহিতৈষী, তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে মহাভারত প্রায় নীরব। পরাশরকে তিনি চোখেই দেখেননি, সত্যবতীর সঙ্গে মাতাপুত্র সম্পর্ক ধরে এমন কোনও আলাপ নেই যার থেকে সত্যবতীর অপত্যস্নেহ বা ব্যাসের মাতৃভক্তির কোনও নিদর্শন পাই। তিনি জননীর আজ্ঞা পালন করেছেন, কিন্তু সেটা ত কর্তব্য, জননীকে ভালবেসে বা ভক্তি করে তা করেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। শুকের সম্পর্কেও খবর মেলে

দেবীভাগবত পুরাণে–মহাভারত তাঁর সম্পর্কে প্রায় নীরব। সেখানে শুধু শুনি আর পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে শুকও তার কাছে বিদ্যালাভ করেছেন ও মহাভারত শুনেছেন।(২৭) পিতাপুত্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথাও চিত্রিত হয়নি। তা হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক মানবিক সম্পর্কগুলির মধ্যে ব্যাসকে দেখানেই হয়নি, অথচ ব্যাস সারা মহাভারত জুড়ে বিস্তর মানবিক সম্পর্কের আলেখ্য আঁকলেন। পাঠক বিব্রত বোধ করেন: ব্যাসের জীবন এমন নিরালম্ব রূপে দেখানো হল কেন? রামায়ণের শুরুতে এবং গোটা উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বর্তমান এবং সেখানে তিনি কঠোর তপস্বী, সীতার স্নেহপরায়ণ পালকপিতা, লবকুশের আচার্য এবং সীতা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি মর্মান্তিক অবিচার করার জন্যে কঠিন শপথ করে রামকে ধিক্কার দিচ্ছেন। এখানে কোথাও কোনও বিরোধ নেই। সীতা ও লবকুশ ছাড়া কোনও মানবিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপিত করা হয়নি, যেখানে তিনি দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিভক্ত।

ব্যাস কিন্তু নানা ভাবেই জটিল। কী ভাবে ব্যাসকে দেখব? তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল কেটেছে তপস্যায়। জীবনের নানা পর্ব সম্বন্ধে তার উপদেশ, কিন্তু জীবনকে তিনি ব্যক্তিজীবনের পরিসরে তো দেখলেনই না, সে সম্বন্ধে এত উপদেশ দেওয়ার অধিকার তার জন্মাল কী ভাবে? তখন পাঠককে মনে করতে হয়, অসম্পৃক্ত থাকলে প্রবহমান সংসারের জীবন থেকে যে দূরত্ব থাকে সত্যকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে তা এক ধরনের তৃতীয় নেত্র দেয়; সে এক পূর্ণতর দৃষ্টি পায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা আবিল হয়নি। দূর থেকে অন্যদের জীবন দেখে মনের গভীরে তাকে বিশ্লেষণী উপলব্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারলে যে দেখা, সে শুধু সত্য দেখা নয়, ব্যাপ্তিমান স্থায়ী দেখা, তাৎক্ষণিকের দ্বারা সীমিত নয়। শাস্ত্রে তাই বলে 'কবিঃ ক্রান্তদর্শী'–কবির দৃষ্টি বর্তমান কাল ও অব্যবহিত পরিস্থিতিকে পেরিয়ে দেখতে পায়।

ব্যাসের চরিত্রে অন্য যে ব্যাপারটি পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে দ্বিধার মধ্যে আনে তা হল। ব্যাসের দুটি আচরণ। প্রথম, ব্যাস ঋষির পুত্র, স্বয়ং তপস্বী। কিন্তু রাজপ্রাসাদের, অন্যায় পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির একের পর এক যা যা বাজি রেখে হারছেন তার অনেকটাই যে যুধিষ্ঠিরের অনধিকারের সীমায় তা তিনি নির্দেশ করলেন না। এর ফলে প্রকাশ্য রাজসভায় রাজনন্দিনী, রাজকুলবধুর মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ঘটল, ঋষির বিবেক তা নিস্প্রতিবাদে দেখল। এইখানে ব্যাসের প্রথম ও প্রধান অপরাধ, বাকি অপরাধগুলি এর থেকেই এসেছে। কৌরবদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ করতে প্রয়াসী হননি। সারা যুদ্ধকাণ্ড ব্যাপ্ত করে দেখি, ব্যাস দ্বিমনা, তার আনুগত্যও যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর অন্তরের পক্ষপাতিত্ব যে পাণ্ডবদের পক্ষে, এতে কোনও সন্দেহ থাকে না; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুজনেই তার ঔরস সন্তান (নিয়োগের বলে)। এদের মধ্যে তিনি পক্ষপাতশূন্য আচরণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি, যা বিবেকবান ঋষির পক্ষে অন্যায়। যুযুৎসু বা বিদুর যে নিরপেক্ষতা দেখিয়েছেন, ব্যাস তা পারেননি। তার

বিবেক দ্বিধাগ্রস্ত। মহাভারত-প্রণেতা ঋষিকবি সম্বন্ধে পাঠকের কী প্রতিক্রিয়া হবে? তাকে বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করবে, না তার বিচারে বিমুখ থাকবে? এই ব্যাপারটা পাঠককে রীতিমত ব্যাকুল করে এবং ধীরে ধীরে চরম এক প্রত্যয়ে পৌঁছে দেয়; তা হল: কেবলমাত্র মর্মান্তিক আন্ততি থেকেই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। ব্যাস যদি সরলরৈখিক চরিত্র হতেন, বাল্মীকির মতো শুধু শেষ পর্বে অপমান ও প্রত্যাখ্যান পেতেন তা হলে তাঁর সৃষ্টিও রামায়ণের মতোই সরল হত, পাঠকের প্রতিক্রিয়াতে এত জটিলতা বা যন্ত্রণা থাকত না। কিন্তু ব্যাসের জীবন, উপলব্ধি, আন্তর-সংঘাত সবই তাকে ধীরে ধীরে মহৎ সৃষ্টির স্রষ্টায় পরিণত করেছিল, তাই পাঠকের পক্ষে তাঁর জীবন বা সৃষ্টি কোনওটারই প্রতি সাড়া দেওয়া সহজ হয় না–এত মহৎ, এত দুরূহ, এত ঐশ্বর্যবান মহাকাব্যে সাড়া দেওয়াও সে জন্যে বহু মমর্যন্ত্রণা, বোধ ও বোধির বহু যাতনাময় স্তর পেরিয়ে তবেই সম্ভব। এ মহাকাব্যের জনপ্রিয় হওয়ার কথাই ওঠে না: মানস ক্লেশে দীর্ণ, জীবনের উপলব্ধিতে ঋদ্ধ, ধর্মবোধে ভাস্বর যে পাঠক এ মহাকাব্য তারই প্রিয়। সংখ্যায়। তারা অল্প, কিন্তু তাৎপর্যে তারা গরীয়ান।

সংশয়ের উজ্জ্বলতা

সারা পৃথিবীতে বেশ কিছু মহাকাব্য রচিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য গিলগামেশা থেকে যদি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ভার্জিলের কাব্য পর্যন্ত ধরি তা হলে এগুলি সংখ্যাতেও কম নয়। কালের ব্যাপ্তিতেও বিপুল। সাধারণত মহাকাব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: প্রাথমিক পর্বের, গিলগামেশা, হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি; আর দ্বিতীয় পর্যায়ের, ওভিদ, ভার্জিল, প্রভৃতি। ভারতবর্ষের দুটি মহাকাব্যই প্রাথমিক। এই ধরনের মহাকাব্যের কতকগুলি স্বতন্ত্র লক্ষণ থাকে। এগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। গিলগামেশ-এর রচয়িতার নামই জানা যায় না; হোমার বা ব্যাস বাল্মীকি সম্বন্ধে যা জানি তার প্রামাণ্যতা সংশয়িত, কেননা তা অনেক পরবর্তী যুগের, বা সম্ভবত তাঁদেরই রচনার প্রক্ষিপ্ত অংশের থেকে সংকলিত। কাজেই রচয়িতার অনামিক কিংবা কিংবদন্তী-নির্ভর হওয়াটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হল, প্রাথমিক মহাকাব্যকাররা নিজেদের যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে কাব্যে তাঁদের দেশের ও কালের এমন একটা পর্বের কথা বলেন যখন তাদের জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা বা ঘটনাবলি কবির লেখনীর সাহায্যে অমরত দাবি করে। এই কবিরা যেন সমস্ত জাতির হয়ে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থেকে মহাকাব্যগুলি রচনা করেন।

কেন? কী তাঁদের প্রেরণা দেয়? শুধু কি কোনও কাহিনিকে অবলম্বন করে কাব্য রচনাই এঁদের উদ্‌ধৃদ্ধ করে? তেমন বহু কাহিনি তো লোকমুখে ভ্রাম্যমাণ থাকে দীর্ঘকাল, দূরদূরান্তরে গাথাসাহিত্যের আকারে। মহাকবি কাহিনিগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন মাত্র, নিজস্ব সংযোজন দিয়ে। তা হলে কাহিনি ও গাথার অতিরিক্ত

কিছুই তাঁদের উপজীব্য, যাকে মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ্যে নিবেদন করাই তাদের উদ্দেশ্য। এই অতিরিক্তটুকু কী? জাতীয় জীবনের কোনও ঘটনা-সম্পাত বিশেষ মুহূর্তে মহাকবির চিত্তে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে যাতে তাঁর আবাল্য-অভ্যস্ত সমাজ-স্বীকৃত সব মূল্যবোধের শিকড়ে টান পড়ে; এতে আবার সব কিছু নিয়ে নতুন করে বোঝাপড়া করতে হয় নিজের সঙ্গে— সমকালীন সমস্ত স্বদেশবাসীর প্রতিভূ হয়ে; এই বোঝাপড়ার শেষ নির্যাসটুকু তুলে দিতে হয় দেশবাসীকে; সেই সময়, এই কারণ এবং প্রক্রিয়াতেই, জন্ম নেয় মহাকাব্য। কাজেই মহাকাব্যে কবি গৌণ, দেশবাসীরাও ব্যক্তি হিসেবে গৌণ। যে সকল ঘটনার অভিঘাতে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মহাকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা হিসেবে সেগুলিও গৌণ। এ সকলের সমাবেশে জনজীবনে যে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অস্ফুট ভাবে সচেতন, কবি সেই সংঘাতকে আত্মস্থ করে তাকে অর্থবহ রূপ দেন মহাকাব্যে। তখন পাঠক বা শ্রোতা মহাকাব্যের মধ্যে খুঁজে পান মূল্যবোধের সংক্ষোভে বিচলিত তাঁর আপনি চিত্তের প্রতিরূপ, তাঁর কিছু সংশয়ের সমাধান, কিছু বা নতুন প্রশ্ন যা তাঁকে ভাবাবে এবং উন্নততর জীবনবোধের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এ কথা সত্য যে, মানুষ স্বেচ্ছায় মূল্যবোধের বিরোধে সংক্ষুব্ধ হতে চায় না। পারলে সে অভ্যস্ত পরিবেশের অভ্যস্ত মূল্যবোধের আবহে শান্তিতে, নির্দ্বন্দ্বে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই করেও থাকে। কিন্তু মূল্যবোধের সংকট কারও কারও জীবনে আসে। যেমন দশরথের সামনে দুটি শ্রেয়োনীতির বিকল্প ছিল: কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন অধিকার সমর্থন করা। লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, এঁদের কথায় এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। জরাগ্রস্ত, বিকলচিত্ত দশরথ ওই দ্বন্দ্বের সামনে এসে এত বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সিন্ধুমুনির অভিশাপের উপাখ্যান উদ্ভাবন করতে হয়েছে, যার ফলে দশরথের নৈতিক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে অতিলৌকিকের দ্বারা। কিন্তু আসলে দুর্বলচিত্ত রাজা কৈকেয়ীর অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না–একদা তাঁর প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল বলে, এবং এই আপৎকালে তার অনর্থ করবার প্রচণ্ড শক্তি জানতেন বলে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বাসরে রাষ্ট্রের মঙ্গলের যুক্তি ও জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার যে সমগ্র প্রজাকুলের কাছে রাজার অকথিত অঙ্গীকার–এ কথা বলবার নৈতিক সাহস দশরথ খুঁজে পেলেন না। তেমনই স্নেহময় পিতা যখন রামকে ডেকে পাঠিয়ে অভিষেকের পরিবর্তে চতুর্দশ বৎসরের জন্যে বনে নির্বাসনের সংবাদ দেন তখন দেখা দেয় অনাশঙ্কিত সংঘাত; রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে রাজ্যাধিকার দাবি করবেন, না পিতার নির্দেশ মেনে নেবেন? পরে আবার সবার অলক্ষ্যে নির্বাসনভূমিতে যখন ভাই ভরত এসে রাজ্য প্রত্যর্পণ করবার জন্যে মিনতি করেন তখন পুনর্বার সে সংকটের মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে।

এ কোন সংকট? শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নয়, দুটি ন্যায়সংগত বিকল্পের মধ্যেই বিরোধ। ভারতের অনুরোধে রাজ্য গ্রহণ করলে রাম পিতৃ-সত্য রক্ষা না করার অপরাধে অপরাধী হন না। কারণ, পিতার নির্দেশে বনে যাওয়াতেই তো পিতৃ-সত্য রক্ষা করা হয়েছে। বিমাতা যাকে রাজা করতে চান। তিনি স্বয়ং যদি জ্যেষ্ঠকে রাজ্য দিতে চানই তাতে তো পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। এখানে দুটি মূল্যবোধের সংঘর্ষ। এমন ঘটনা মানুষের জীবনে মাঝে মাঝেই ঘটে। রাবণের অন্তঃপুরে সীতা হনুমানের দেখা পাবেন এবং রাম তাকে উদ্ধার করবেন এমন আশ্বাসের নিশ্চয়তা দূরে থাক, সম্ভাবনাই ছিল না। সে অবস্থায় দু'মাস পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে জেনেও রাবণের প্রস্তাবে যখন তিনি সম্মত হননি, তখন রামের প্রতি প্রেম ও আনুগত্য লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত হল। এর পরে বাল্মীকি স্বয়ং যখন রামের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেন যে, সীতা যদি কায়মনোবাক্যে রামেরই প্রতি অনুরক্তা না হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর বহু সহস্র বৎসরের তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনের কোনও ফলই যেন তিনি না পান। তখন রামের সম্মুখে দুটি শ্রেয়ের বিরোধ দেখা দেয়: প্রজারঞ্জন ও মহর্ষি বাল্মীকির বাক্যে আস্থা স্থাপন করে প্রকাশ্যে সীতার শুচিত ঘোষণা করে তাকে গ্রহণ করার বিকল্প। দুটিই ধর্মসংগত। কাজেই মূল্যবোধের সংঘাতে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন, তা শেষ পর্যন্ত ধর্মসংকটের রূপেই দেখা দেয়। শুধু শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হলে ধর্ম ও অধর্মের বিরোধেই তা পর্যবসিত হত, ধর্মসংকট হত না। নীতি ও দুনীতির মধ্যে বিকল্পগুলির গ্রহণ-বর্জন অনেক বেশি সহজ ও সরলরৈখিক।

রামায়ণে এ ধরনের সংকট বেশি নেই বলেই রামায়ণের জনপ্রিয়তা সহজে এসেছে এবং বেশি ব্যাপক ও স্থায়ী হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক, দাম্পত্য, সৌভ্রাত্রা, বন্ধুকৃত্য, পরিবারের মর্যাদারীক্ষণ, শত্রুনিপাত ও তার বাইরে প্রজরঞ্জনের একটা অস্পষ্ট মহনীয়তাএই সবই রামায়ণের মূল্যাবোধে সংকট এনেছে এবং এগুলির অধিকাংশেরই নিস্পত্তি হয়েছে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব হিসেবেই।

মহাকাব্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বও থাকে, কিন্তু তাতে মহাকাব্যের যথার্থ চরিত্র নিরূপিত হয় না। ধৃতরাষ্ট্র যখন অপত্যস্নেহ ও রাজকৃত্যের মধ্যে অন্ধ পিতৃস্নেহকে প্রাধান্য দেন তখন আপামর-সাধারণ তার রাজকর্তব্যে ঔদাসীন্য বা অবহেলাকে নিন্দ করেন, কারণ শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তিনি নৈতিক ভাবে পরাজিত। ওই একই দ্বন্দ্বে গান্ধারী পরাজয় স্বীকার করেননি।(১) যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে শৈশবে স্নেহে লালন করেছেন, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আশীর্বাদপ্রার্থী সেই পুত্রের জয়কামনা করতে পারেননি।' না পারার জন্যে তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনাদীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত সরল দ্বন্দ্বে তাঁর একটি পক্ষ বেছে নেওয়া তত কঠিন ছিল না, কারণ, এ দ্বন্দ্ব দুই মেরুর মধ্যে সাদা-কালোর মতোই স্পষ্ট। কিন্তু দুর্বতসভায় যখন নীরবে কৌরব মহারথীরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখেন তখন তাদের সামনে দুটি বিরুদ্ধ মূল্যবোধের সংঘর্ষ ছিল। দুটিরই সপক্ষে যুক্তি ছিল। তাঁরা কৌরবের অন্নে প্রতিপালিত, কৌরবদের দ্বারা সংরক্ষিত,

অতএব কৌরব-পক্ষ সমর্থন করার পক্ষে তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল। অপরপক্ষে এরও ওপরে ধর্মবোধ, যা নিঃসহায় রমণীর প্রকাশ্য, চুড়ান্ত অপমানের প্রতিকার করার স্পষ্ট পুরুষোচিত ও ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যের দায়, জনমানসে সেটিরও নৈতিক সমর্থন ছিল। তেমনই যুধিষ্ঠিরের ক্ষত্রিয় কর্তব্য ও মানবিক কর্তব্যের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিল, তখন তিনি যে শ্রেয়স্তর নীতিকে অবলম্বন করে আপাত ভাবে ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হতে সাহস করেছিলেন। এখানেই তার ধর্মসংকটে বিজয়ের প্রমাণ থেকে গেছে। এইখানে, এবং শুধুই এইখানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কৌরবপক্ষের ঊর্ধ্বে ধর্মবিজয়ীর গৌরব পেলেন পাণ্ডবরা এবং পাণ্ডবপক্ষ হয়ে উঠল। ন্যায়পক্ষ, ধর্মপক্ষ। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণ মহিমা সংকীর্তনের জন্য আদিপর্বে যে সংযোজন, 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে বিজয়', এই দাবি অসার ও অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, কারণ ধর্মসংকট কৃষ্ণের সামনে আসেনি, এসেছিল পাণ্ডবদের সামনে, বারংবার, এবং নিষ্ঠুর বিকল্পের রূপ ধরে। সেইখানে পাণ্ডবরা বিজয়ী, যুদ্ধের শেষ পরিণতির অনেক আগে থেকেই। বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে বলেন, তিনি একটি মাত্র ভাইকে সঞ্জীবিত করতে পারেন, তখন যুধিষ্ঠির সকলের অগোচরে একটি সংকটের সম্মুখীন হন এবং অনায়াসে মহত্তর মূল্যবোধে প্রণোদিত হয়ে সহোদর ভাইয়ের পরিবর্তে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নাম বলেন।(২) অর্জ্জুন, যাঁর অস্ত্রবিদ্যা রণকৌশল সর্বজনবিদিত, তিনি যুদ্ধের পূর্বে ভ্রাতৃহত্যা, স্বজনহত্যার শঙ্কায় যখন বিচলিত হয়ে অস্ত্রত্যাগ করতে উদ্যত হন, তখন তিনি ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়ে উন্নততর বিকল্পকে আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, রণকুশল অর্জ্জুনের চেয়ে এই অর্জ্জুনের চরিত্র উজ্জ্বলতর। তাঁর এই হৃদয়দৌর্বল্য ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। এই ইতস্তত করার মুহূর্তে তিনি পাণ্ডবপক্ষকে ধর্মসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মহত্তর মহিমায় মণ্ডিত করলেন। বিজয়ী যুধিষ্ঠির যে দিন সাশ্রঙ্কুকণ্ঠে সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হলেন, সে দিন তার নৈতিক জয় এমন এক মাত্রা লাভ করল যা আয়ত্ত করা লুব্ধ দুর্যোধনের পক্ষে বা দাম্ভিক কর্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজয়ের পর, রাজমাতা কুন্তি যখন পরাজিত পক্ষের সঙ্গে বনগমন করেন, তখন তাঁরও সামনে দুটি ন্যায়সংগত বিকল্প ছিল: তাঁর দুঃখী পুত্ররা বহুকষ্টে যে বিজয় লাভ করেছেন তার জন্যে তাদেরকে অভিনন্দিত করে তাদের সঙ্গে রাজমাতা হয়ে থাকা, যা ছিল প্রত্যাশিত এবং সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত, এবং বনাগমন। কিন্তু ওই ভিতরে-বাইরে সর্বস্বান্ত প্রাক্তন রাজদম্পতি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে উক্ত-অনুক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করবেন তাদেরই পূর্বতন গৌরবের শ্মশান হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে, বা গভীর নির্বোদে, আত্মগ্লানিতে বনে যাবেন এ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? এদের চেয়ে অনেক কম বয়সে তিনি নিজে বনবাসের ক্লেশ ভোগ করেছেন, তাই আর কিছু দিতে না পারলেও সাহচর্যটুকু দিতে উদ্যত হলেন। কুন্তির ধর্মসংকটের দুটি মেরুই বৈধ; কিন্তু দুঃখময়, বিকল্প বেছে নিতে পেরে তিনি ধর্মের নতুন এক ঔজ্জ্বল্যকে স্পর্শ করলেন।

জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন

কর্ণ যেদিন কুন্তির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন সে দিন তীরও দুটি বিকল্পই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুচির-প্রতীক্ষিত জননী মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সন্তানকে আমন্ত্রণ করছেন জ্যেষ্ঠ কৌন্তেয়ের মর্যাদায়, আপন মাতৃস্নেহের আশ্রয়ে, একে স্বীকার করার মধ্যে অন্যায় ছিল না। সত্যই তো তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জয়ী হলে অনুজ পাণ্ডবদের ঊর্ধ্বের্বাতাঁর স্থান হত; এ গৌরব স্বীকার করলেও কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটত না। প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দীর্ঘ-সঞ্চিত অভিমান নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আরও কিছু ছিল: অধিরথ এবং রাধার কাছে আশৈশবকাল যে স্নেহসিক্ত আশ্রয়ে লালিত, তার অমর্যাদা ঘটত। দাতা কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণেরও অদেয় ছিল কুন্তিকে এ দান। বীর কর্ণ বীরের সদগতি থেকে ভ্রষ্ট হলেন না, সূর্যের সন্তান জ্যোতির্ময় আত্মত্যাগে শ্রেয়স্তর বিকল্প স্বীকার করে নিলেন, পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত জেনেও। এইখানেই কর্ণের। মহত্ত্ব; প্রথম কৌরবপর্যায়ের মহাকাব্যের তিনিই তো নায়ক। সেই চরিত্র মেঘের পশ্চাতে বিদ্যুৎ-রেখার মতো মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, তাই অক্লেশে ক্লেশবরণ করতে পারলেন। অখ্যাত, দুর্যোধনের আশ্রিত, সূতপুত্র, এই পরিচয় নিয়েই পৃথিবী ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। তাঁর ধর্মসংকট তীব্র ও মর্মন্তুদ, তাই সেইখানে তার ধর্মবিজয় এত গৌরবের।

ভুলে গেলে চলবে না যে, সব মহাকাব্যের নায়কই মানুষ, উপন্যায়ক ও প্রতিনায়করাও মানুষ। সংগ্রামটা দেবাসুরে নয়, মানুষে মানুষেই। এবং এই সংগ্রাম যখন চরিত্রগুলির মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁদের এনে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রায় সমান গুরুত্বের দুটি ধর্মগত বিকল্পের সামনে, তখনই তাদের চরিত্রবলের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পরীক্ষা এই কারণে যে, যে কোনও বিকল্পই সমাজ ধর্মসংগত বলে স্বীকার করে নেবে–নীতিভ্রষ্ট বা অধার্মিক বলে দোষারোপ করবে না। বিকল্পগুলির ওজন আপাত ভাবে সমান বলেই সংকট, এবং আত্মত্যাগের পক্ষ, আপাত লাভের ও সমৃদ্ধির পক্ষ ত্যাগ করার মধ্যেই তাদের আত্মিক জয় নিহিত।

মহাকাব্য এ ভাবে ধর্মসংকটকে চিত্রিত করে কেন? মানুষ মহাকাব্যের কাছে কী প্রত্যাশা করে?–পথনির্দেশ। পাঠকশ্রোতাদের জীবনও ধর্মসংকট-সংকুল, বারে বারেই তাদের সামনে দুটি শ্রেয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীর রূপে দেখা দেয়। এর মধ্যে যেহেতু কোনওটিই ধর্মাচরণে নীতিবহির্ভূত নয়, তাই সংকট। আদর্শকে কত উচ্চে মানুষ স্থাপন করতে পারে এবং তার জন্যে কত মর্মর্যন্ত্রণার মূল্য দিতে পারে তারই নিরিখ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহাকাব্যের কেন্দ্র চরিত্রগুলি। ধর্মসংকটে যারা হার মানল তারা প্রতিনায়ক, মানুষের ধর্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্ম-প্রত্যাশা সেখানে গিয়ে প্রতিহত হল। স্বার্থসন্ধানী, আত্মসুখপরায়ণ থেকেও কতকাদূর পর্যন্ত ধর্মপথে থাকা যায়, কিন্তু এমন একটি গিরিশিখর আছে যা শুধু কঠিন দুঃখে অধিরোহণ করা যায় বলেই তার উচ্চতা,

শুভ্রতা মানুষকে সম্ভ্রমে নত করে। ইচ্ছে করলে সে দুঃসাধ্য শৈলশিখরকে নীচে থেকে প্রদক্ষিণ করেও জীবনের পথ-পরিক্রম সমাধান করা যায়। কিন্তু মহান যাঁরা তাঁরা ওই পথক্লেশের ভয়ে বিচলিত হন না, বরং স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে ওই উত্তুঙ্গ শিখর অভিমুখে আরোহণ করেন। নিচের থেকে মানুষ ওই উধর্ব্বগামী দুঃখসাধন ব্রতী আদর্শনিষ্ঠ মানুষের পরিক্রমা চেয়ে দেখে। শ্বাপদ আছে, আছে পথের দুঃসহ একাকিস্তৃত্ব ও নৈঃসঙ্গ্য; কিন্তু আন্তরবলে বলীয়ান, নৈতিক শৌর্যে দৃঢ়চিত্ত যে-মানুষ পথের এই সব বিপদ জেনে দুঃখময় পথ বরণ করেছেন, নিচের মানুষ তাঁদের দেখে পথনির্দেশ পায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তারা আপন জীবনের ধর্মসংকটে কোন বিকল্পকে আশ্রয় করবে তার এক দিকনির্দেশ পায়। এই পাওয়াটা সত্য হয়, কারণ মহাকাব্যের নায়কও দেবতা নয়, প্রতিপক্ষও অসুর নয়। মানুষের সংকটে মানুষই পথ দেখাতে পারে। নির্দোষ পাণ্ডবরা দ্বাদশবর্ষ বনে নির্বাসিত, রামলক্ষণ-সীতাকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী দেখে নিষ্কারণে নির্যাতিত মানুষ শক্তি পায়। যখন দুটি নীতিনিষ্ঠ বিকল্পের দুরত্যয় সংকটের সামনে মানুষ এসে পৌঁছয় তখন মহাকাব্যের চরিত্রদের অনুরূপ বিপর্যয়কালের আচরণ দীপাবর্তিকা হয়ে পথ দেখায়। নীতির সংকট জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে; রোগ শোক ব্যাধি দৈন্যের চেয়ে অনেক বেশি এই নীতির সংকটের অন্ধকার। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা মানুষের জীবনে পথচিহ্ন বিলোপ করে। তখনই মহাকাব্যের মানুষ-নায়ক পথভ্রষ্ট এই মানুষের অভিমুখে বাহু প্রসারিত করে, আত্মিক দীপালোকের পথে তাদের প্রবর্তনা দেয়। সে পথ দুঃখ ক্লেশে সমাকীর্ণ, এবং সেই কারণেই ধর্মসংকট হতে উত্তীর্ণ মানুষ গৌরবে আলোকিত। দুর্বল অনুগামী নিজেকে বলতে পারে, 'ধর্মধর্মবিভ্রান্ত ওই মানুষটি যদি এত যন্ত্রণার মূল্যে শ্রেয়স্তরকে বরণ করতে পেরে থাকে, তবে আমিও পারি।' এবং টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কঠিন পথে, কঠিন উত্তরণের গৌরবের অভিমুখে।

পরিশেষে, এই ধর্মসংকটগুলির যোগফল কী? কেন এগুলিকে মহাকাব্যে এ ভাবে উপস্থাপিত করা হয়? উদ্দেশ্য একটিই; জীবনবোধের পুনর্মূল্যায়ন। কতকগুলি বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সমাজে ব্যাপ্ত থাকে, সেগুলি মানুষ উত্তরাধিকার-সূত্রে পায় এবং তা থেকে জীবনের পথসংকেত পায়। তার পর, সহসা কোনও অনাশঙ্কিত ঘটনায় পুরনো মূল্যবোধ হঠাৎ অর্থহীন, অচল হয়ে যায়। দুটি পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সামনে তখন মানুষ দিগভ্রান্ত বোধ করে। তখন তার প্রয়োজন হয় নতুন মূল্যবোধের। এই প্রয়োজন ধর্মসংকটের; এমন বহু বিচিত্র ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন মহাকাব্যের চরিত্রেরা, এবং পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের আন্তর-বোধ ও শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় নতুন মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। পাঠকশ্রোতা যখন জীবনের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে দুটি বিরোধী নীতির মধ্যে নির্বাচন করতে বাধ্য হন তখন মহাকাব্যের নায়কের অনুরূপ অবস্থার সিদ্ধান্ত ও আচরণ তাঁকে পথ দেখায়। মানুষের জীবনের অন্তঃসংঘাতে মহাকাব্যের মানুষ-নায়কের সিদ্ধান্তই পথ দেখাতে পারে। তাই কৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক হতে পারেন না। বন্ধুকে আত্মিক সংকট থেকে ত্রাণ করবার

উপায় হিসেবে বিশ্বরূপ-দর্শন করানোর জাদু যাঁর আয়ত্তে আছে তিনি তো দেবতা, সর্বশক্তিমান; স্বল্পশক্তি মানুষ তার কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পায় না, কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। তাই যুধিষ্ঠির নায়ক, কারণ বারে বারে তিনি অন্তর্দ্ধান্দ্ব, মূল্যবোধের দ্বৈধতায় পীড়িত হন, দুটি বিপরীত নীতির সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করেন, বহু যন্ত্রণার মধ্যে দ্বিধা নিরসনের জন্যে একটি মূল্যবোধকে বেছে নেন। এই সময়ে তিনি নৈতিক সংশয়ে মুহ্যমান সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং মানুষ তাঁর কাছে সংকেত পায় নিজের মূল্যবোধের সংঘাতে সিদ্ধান্ত খুঁজে নিতে।

মহাকাব্যের মূল বিষয়গুলিই হল এই ধর্মসংকট। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভাবে এর সমাধান করেছে। ধর্মসংকট দুর্যোধনের কাছেও এসেছিল: পাণ্ডবদের উৎকর্ষ মেনে নেওয়া অথবা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুশাসন মেনে যুদ্ধ করে যাওয়া। তার পর একদিন এল বিরাটপর্বের শেষে, যখন পাণ্ডবদের উৎকর্ষ পরাজয় হানল দুর্যোধনের ওপরে। সে দিন দুর্যোধনের কী প্রতিক্রিয়া? বসে আছেন প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা সংকল্প নিয়ে; তাকে সে দিন পথ দেখাল কে? কৃত্যারা; অর্থাৎ পাতালের মন্দশক্তি। ম্যাকবেথকে যেমন ডাইনিরা অর্ধ-সত্য অর্ধ-মিথ্যার প্রহেলিকা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল ঠিক তেমনই কৃত্যারা দুর্যোধনকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করল।'(১) মানুষ তাই নৈতিক সংকটে দুর্যোধনের আচরণ বা সিদ্ধান্ত থেকে কোনও যথার্থ অনুপ্রেরণা পায় না। পুরুষের অর্থাৎ যথার্থ মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছে মহাভারত: 'যার পুণ্যকর্মের ধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে সে ততদিনই জীবিত থাকে যত দিন ওই ধ্বনি থাকে।'(২) আত্মিক শৌর্যে ঋদ্ধ নায়ক, দুরূহ ধর্মসংকটে যার শুভবুদ্ধি তাকে মানুষের হিতকর সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয়, তেমন নায়কের আচরণ আজও পথনির্দেশ করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ, দুটি শ্রেয়ের মধ্যে আনুপাতিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে আপনি আচরণকে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই মানুষ যুগে যুগে বারে বারে ফিরে আসে জীবনবোধের উৎস-সাহিত্য মহাকাব্যে। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই জীবনের পুনর্মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠিত; এর আদিমতম সূচনা মহাকাব্য। এই কারণেই তা অমর।

রামায়ণ: সহজ পথরেখা

সব মহাকাব্যই কাব্য কিন্তু সব কাব্য মহাকাব্য নয়। মহাকাব্যের নিরিখ নানা সাহিত্যে নানা সংজ্ঞায় নিরূপিত হয়েছে। তবে, মোটের ওপর বিগত পাঁচ হাজার বছরের বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি মানুষ কতকগুলি কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছে, যদিও গুণগত মানে এগুলির মূল্য সমান নয়।

কাব্য সম্বন্ধে বরং একটা মোটামুটি ঐকমত্য আছে: যা মানুষকে চিন্তায় এবং/বা আবেগের ভূমিতে আন্দোলিত করে এবং জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে প্রণোদিত করে, তা-ই উচ্চস্তরের কাব্য। শুধুমাত্র বর্ণনা, বা যে-কোনও রস সৃষ্টি করে যা মানুষকে আপ্লুত করে তাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মূল্যের পরিমাপে তার স্থান সাহিত্যে খুব উঁচুতে নয়। কাব্যের আঙ্গিক তার বহিরঙ্গ, যেমন ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্য এ-বিষয়ে একটা সুস্থ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে, ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টিমাত্রকেই কাব্য বলেনি। ধর্মসূত্র, পুরাণ, ছন্দশাস্ত্র, অলংকারগ্রন্থ, কোষগ্রন্থ, এমনকী কিছু কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থও ছন্দে রচিত; কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকরা সেগুলিকে কখনওই কাব্য বলেনি। অপর পক্ষে গদ্যে রচিত কাদম্বরী বা হর্ষচরিত-কে কাব্য বলা হয়েছে। কাজেই সংস্কৃতে বিষয়বস্তু বা বহিরঙ্গ দিয়ে কাব্যত্ব বা গদ্যত্ব নির্ণীত হয়নি, ভাব ও রস দিয়েই তা হয়েছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও বহু তথাকথিত কাব্য বেশ অপকৃষ্ট রচনা, কষ্ট-কল্পিত, কৃত্রিম, অলংকার-বহুল; চমক সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। তবু আঙ্গিকের ঊর্ধ্বের্ব নিরিখের স্থাপনা করা হয়েছিল–এটিও প্রণিধানযোগ্য।

তা হলে প্রশ্ন আসে, মহাকাব্য কীসে মহাকাব্য হয়? সে আলোচনার পূর্বে বলে নেওয়া উচিত, মহাকাব্য প্রধানত দু'ধরনের হয়: আদি মহাকাব্য ও পরবর্তী যুগের মহাকাব্য। বস্তুত এই পরবর্তী যুগের মহাকাব্যও দু'শ্রেণির: চরিত্রগত ভাবে মহাকাব্য ও সংজ্ঞানির্ভর মহাকাব্য। আদি মহাকাব্যের উদাহরণ গিলগামেশা, মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়াড, অডিসি এবং সম্ভবত ঈনীড। গৌণ বা পরবর্তীকালে মহাকাব্যে প্রথম শ্রেণিটিতে পড়ে অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্য, মিলটনের মহাকাব্যদ্বয়, দান্তের মহাকাব্যত্রয়ী, গ্যেটের মহাকাব্য, কালেকুলা, নীবেলুঙ্গেনলীড, এল সিড, ইত্যাদি। এর দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত হল দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের মহাকাব্য এবং ইয়োরোপে প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে কিছু রচনা। আদি মহাকাব্যের পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতে ওই প্রাথমিক মহাকাব্যের প্রভাব চোখে পড়ে, যেন আদি মহাকাব্যকে আদর্শ ধরে আরও সংহত পরিপাট্যে এগুলি রচিত। প্রাথমিক মহাকাব্যগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা তাদের নাম ছাড়া কিছুই জানি না। গিলগামেশ-এর ক্ষেত্রে তাও জানি না। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের জীবন, কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কোনও তথ্যসূত্র কোথাও নেই। নীবেলুঙ্গেনলীড, কালেকুলা বা এল সিড সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, কিন্তু মিলটন, দান্তে, গ্যেটের জীবনী আমাদের পরিচিত, এঁরা অনেকটা পরের যুগের বলেই হয়তো এদের ইতিহাস কিছু জানা যায়। ভারবি, মাঘ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তার কারণ অবশ্য ভারতবর্ষের সুবিদিত ইতিহাসবিমুখতা।। এই দ্বিতীয় শ্রেণির দুই বিভাগের মহাকাব্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যেমন আছে, তেমনই আছে সচেতন ভাবে আঙ্গিক সৌষ্ঠব নির্মাণে কবিদের প্রয়াস, যা প্রথম পর্বের মহাকাব্যে নেই বললেই চলে। তা হলে কী আছে সেই আদি মহাকাব্যগুলিতে যা তাদের এমন অমরত্বে মণ্ডিত করেছে? গিলগামেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, সেই যুগকে আমরা এত কম চিনি যে, আঙ্গিক উপজীব্যে মিলে যে সাহিত্য নির্মাণ, তার সামাজিক ও মননগত পটভূমিকাটি

আমাদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, গভীরতা, মানবিক আবেগ ও আবেদন এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্ব লাভ করবার যে তীব্র আকাঙক্ষা এ মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় কোন গুণে এ গ্রন্থ অমর।

কুষাণ সাম্রাজ্যের শেষ দিকে যে সব ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল, গোষ্ঠী ও কৌম সংগঠন ভেঙে যে নতুন 'কুল' বা বৃহৎ যৌথ পরিবারের উদ্ভব হচ্ছিল এবং এ-দুটিকে অবলম্বন করে সমাজের যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল তা বহুলাংশে রামায়ণে প্রতিফলিত। সৌভ্রাত্র্য, দাম্পত্য, অপত্যসম্পর্ক, ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য, শৌর্য, পিতৃসত্য রক্ষা, বন্ধুবাৎসল্য, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ–এ সবই তখনকার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে বাস্তব সমস্যা। রামায়ণে এগুলি গুরুত্ব পেয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে। তাছাড়া, ওই সমাজে বর্ণবিভাজন ক্রমেই কঠোর হয়ে উঠেছিল এবং নারী ও শূদ্রের অবনমন ঘটানোর জন্যে শাস্ত্র রচিত হচ্ছিল; সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা এর অনুকূলে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠছিলেন। তিন বর্ণের দাসত্ব শূদ্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হচ্ছিল এবং পাতিব্রাত্য ও শ্বশুরকুলের প্রতি আনুগত্য নারীর পক্ষে ক্রমেই অবশ্য-পালনীয় হয়ে উঠেছিল। সতীত্ব একটি অপরিহার্য গুণ বলে ধরা হত, ফলে সম্পূর্ণভিত্তিহীন সন্দেহেও স্ত্রীপরিত্যাগ হল স্বামীর কর্তব্য। মহাকাব্য তো। এ সব নিয়েই গঠিত। এরই পরিসরের মধ্যে রাজ্যে নির্লোভ, পিতৃসত্য রক্ষায় অনমনীয় রাম, শুধুমাত্র স্বামীর প্রতি প্রেমে সীতার চোদ্দ বছরের বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ সানন্দে স্বীকার করা, অচিরবিবাহিত লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে দীর্ঘ নির্বাসন মেনে নেওয়া, হনুমানের রামের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য, জটায়ুর বন্ধুকৃত্য করার মধ্যে দিয়ে বিনা দ্বিধায় ধ্রুব মৃত্যু বরণ করা, সুগ্রীবের রামের প্রতি মিত্রতা এবং সে কারণে কষ্ট স্বীকার–এই সব এবং আরও বহুবিধ মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখি মহাকাব্যটিতে। তা ছাড়া নিসর্গবর্ণনাবৃক্ষলতা, অরণ্য, পর্বত, নদী, সমুদ্র, উপত্যক বর্ণনার সঙ্গেই পশু পাখির বর্ণনা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, রাত্রি, প্রত্যুষ এ সবের যে সুন্দর বর্ণনা তার মধ্যে জীবনের সহজ আনন্দের স্পর্শ আছে। তেমনই মানুষের নানা অবস্থাবিপর্যা্য় যে চিত্তবৈকল্য বা স্বতঃস্ফুর্ত আবেগ প্রকাশ পায় তারও সুন্দর বর্ণনা এ মহাকাব্য। এই সব উপাদানে সহজেই পাঠক অভিভূত হয়। রাষ্ট্রের সংকট তো বেশি মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে না, বরং তাকে পারিবারিক মূল্যবোধের সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়তই। এই মূল্যবোধগুলি রামায়ণের নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কাজেই রামায়ণে সাধারণ মানুষ তার সমস্যার চিত্রণ ও সমাধান খুঁজে পেয়েছে; তাই রামায়ণকে ভারতীয় সমাজ সহজে গ্রহণ করেছে আপন স্বল্প পরিসর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে চিত্তলোকের পথপ্রদর্শন হিসেবে। সেখানে মহাভারতের গতিপথ অনেক জটিল, গভীর তার অনুসন্ধান।

মহত্তর সাধনার দিশা

হোমারের দুটি মহাকাব্যের মধ্যে অডিসি রামায়ণের মতো মোটামুটি পরিবারিক ও কতকটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত। প্রকৃতির হাতে অডিসিউসের সুদীর্ঘ নিগ্রহ, পথে নানা বাস্তব অবাস্তব সংকটের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে অবশেষে স্বভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সে আবিষ্কার করে যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিষ্কারণে সুচিরকাল ধরে বিপদে মগ্ন, তরুণ পুত্র টেলিমেকিস এক সে সংকটকে যথাসাধ্য ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে মাত্র, কারণ সমাধানের শক্তি তার নেই। অতএব দীর্ঘ নয়। বৎসরের বিপৎসঙ্কুল পথ-পরিক্রমার পরে অডিসিউসকে শেষ যুদ্ধ করতে হল স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে। এই সুদীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করার মধ্যে অডিসিউস মহানায়ক হয়ে ওঠেন এবং মহাকাব্যটি গভীর একটি মাত্রা পায়।

ইলিয়াড-এ ঘটনা জটিল, সংকট গুরুতর এবং সংগ্রাম কঠিনতর। কারণ এ সংগ্রাম অন্তরে বাহিরে। আকিলিস তুচ্ছ কারণে সমবেত যোদ্ধাদের প্রতি কর্তব্য করতে অসম্মত হয়ে যুদ্ধোদ্যম থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নিজের দলের প্রতি এক ধরনের অবিবেচক বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মেনেলাওসের স্ত্রী হেলেনকে ট্রয়ের রাজকুমার হেলেনের সম্মতিক্রমেই হরণ করে এনেছে। তারই উদ্ধারকল্পে দুস্তর দুঃখের পথ পেরিয়ে মেনেলাওস, আগামেমনন তাঁদের নিজেদের অনুগত সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক নৌবাহিনী নিয়ে ট্রয়ের সিন্ধুতটে শিবির নির্মাণ করে যুদ্ধে উদ্যত। এর মধ্যে আকিলিসের যুদ্ধ বিমুখতায় একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হল। তবু যুদ্ধ চলল, লোকক্ষয় হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ট্রোজানদের হাতে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হলে অসহ্য ক্রোধের বশে আকিলিস অস্ত্রধারণ করলেন, যুদ্ধ ধীরে ধীরে শেষ হল। হেলেনকে নিয়ে গ্রিকরা ফিরলেন স্বদেশে।

এ মহাকাব্যের পরিকল্পনাতেই নানা জটিলতা। যে হেলেন স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে, তাঁর পুনরুদ্ধারের জন্য অগণ্য গ্রিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস পর্যন্ত্রীহরণ করেছে সত্য, কিন্তু সেটা হেলেনের সম্মতিক্রমেই, কাজেইট্রয়ের লোকক্ষয় আরও নিষ্কারণ এবং করুণ। যুদ্ধে এসে বীরের পক্ষে অস্ত্রসংবরণ করা অন্যায়, এটা বীরোচিত আচরণ নয়। তবু আকিলিসেব ক্ষোভের, অভিমানের, হেতুটাও যত তুচ্ছই হোক, সত্য। তাই পদে পদে জটিল হয়ে উঠেছে মূল কাহিনির সূত্রগুলি। সাদাকালো বিভাগ এখানে অচল।

সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের নানা সংঘাত এখানে উপস্থিত এবং কোনওটিরই সরলরৈখিক সমাধান বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া গ্রিকদের মধ্যে নানা জটিল

প্রতিযোগিতা, ট্রোজনদেরও ধর্ম-বিপর্যয়ের অবস্থা, বিভিন্ন বীরের যুদ্ধকালে এবং অন্য সময়েও জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে বীরধর্ম, মানবধর্ম সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মূল্যবোধের ও চেতনার প্রকাশ এ মহাকাব্যটিকে একটি অসামান্য মানবিক গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

পরিশেষে মহাভারত। এর কেন্দ্রে যে যুদ্ধ তা যে কবে কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তার কোনও নজির মেলেনি। কোনও এক সুদূর অতীতে হয়তো ভারতবর্ষে যে যুদ্ধ ঘটেছিল, কিন্তু সে ভারতবর্ষসে দিন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমনকী মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত কিনা, তা আজ কিছু পণ্ডিত গবেষকের চর্চার বিষয়; স্থির সিদ্ধান্তে আসবার মতো উপাদান এখনও পাওয়া যায় না, এ সিদ্ধান্তের সময়ও তাই এখনও আসেনি। কোনও সময়ে কোনও এক জায়গায় যে একটি ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফল ছিল সুদূর বিস্তৃত, এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ বোধ হয় নেই। এও সত্য যে, যুদ্ধের পরে লোকমুখে বীর-গাথা, যুদ্ধবর্ণনা, বিলাপ, বিজয়বর্ণনা, চরিত্রের বিবরণ, ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়তো খ্রিস্টপূর্ব চারশো থেকে খ্রিস্টিয় চারশো সালের মধ্যে–কিছু আগে পরে হতে পারে— এটি মহাকাব্যের রূপ পায়। কোনও মূল সংকলক সম্ভবত পূর্ববতী লোকগাথাগুলিকে সংহত একটি রচনায় সন্নিবিষ্ট করে খ্রিস্টপূর্বপ্রথম শতকের কাছাকাছি এর মূল 'জয়' রূপটি নির্মাণ করেন। তার পরে নৈতিক, দার্শনিক, সর্বজনিক, সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নানা পুরোহিত, পুরাণকার, শাস্ত্রকারীরা–যা তারা তৎকালীন সমাজের পক্ষে হিতকর বা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন–সেই বিভিন্ন অংশগুলিকে তত দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই মহাকাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তখন এর নাম হল 'ভারত'। এর শেষতম অংশ ভার্গব প্রক্ষেপ হল অভি-পৌরাণিক; আজ যা হিন্দু সমাজ বলে পরিচিত তার মূল শাস্ত্রের উদ্ভব এই অংশে। মূল মহাকাব্যের সঙ্গে এই অংশের কাহিনিগত যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে। বরং, মূল অংশের প্রতিপাদ্য বহু মূল্যবোধের বিরুদ্ধ মতাদর্শ এ অংশে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত, বহু দুর্বল উপাখ্যানের দ্বারা তার ভাষ্য রচনা করা হয়েছে।

এই আদি মহাকাব্যটিতে কী ছিল যা একে এমন অনন্য মহিমা দিয়েছে? কীসে এর আদি মহাকাব্যত্ব? একটা জাতি যখন তার উপলব্ধি, বেদনা-যন্ত্রণা, তার অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের সংঘাত, তার মর্মস্থলে 'গভীরতম ভূমিতে ধর্মসংকট উদ্বেলিত হয়ে কোনও কাব্যে সে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চায় তখন সে রচনা হয়ে ওঠে। সে জাতির গভীরতম সত্তর আত্মপ্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই এই আত্মপ্রকাশ বিবৃত হয় একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে। মহাভারতের ক্ষেত্রে কাহিনিটি ঐতিহাসিক হয়ে থাকলেও এর একটি প্রতীকী মূল্য আছে। ধর্মসংকট যেমন শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব, তেমনই দ্বন্দ্ব প্রেয়-প্রেয়স্তরের এবং শ্রেয়-শ্রেয়স্তরের; আবার, তেমনই দ্বন্দ্ব সমাজে স্বীকৃত বর্ণধর্মের অথবা আশ্রমধর্মের কোনও বিশেষ তৎকালীন ধর্মের কিংবা এ সকলকে অতিক্রম করে যে মানবধর্ম তার সঙ্গে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলে মানুষ সহসা বিপর্যস্ত ও

উদ্রান্ত বোধ করে; যে নীতিবোধের আকল্পে সে আশৈশব শিক্ষিত, সহসা তার বিরোধী নীতি যদি কোনও সংকটের মুহূর্তে গ্রহণের দাবি জানায়, তা হলে একটিকে বর্জন করে অন্যটিকে অবলম্বন করবার জন্যে কোনও সর্বজনস্বীকৃত নীতি যেহেতু নেই, সেখানে তাই মানুষকে নিজের অন্তরাত্মার মুখোমুহকি দাঁড়িয়ে গ্রহণ-বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মহাভারত তার বহুচরিত্রকেবারে বারেই এই ধরনের ধর্মসংকটের সামনে টেনে এনেছে; ফলে কাব্যটি ধর্ম সংকটের। অতএব এ-কাব্য বাস্তবজীবনে অনুরূপ সংকটে পথপ্রদর্শনের সংকেত দিতে সমর্থ। এইখানে মহাভারতের মহাকাব্য-গরিমা।

এ-কাব্যের কাব্যগুণ অবিসংবাদিত, যদিও ভার্গবপ্রক্ষেপের শেষ দিকে অনেক অংশই এমন সাম্প্রদায়িক পুরোহিতের রচনা যাঁরা কবি নন। ফলে সেই সব অংশে রচনা ক্লিষ্ট; তালিকা, বিবরণ ও ক্লান্তিকর উপদেশাত্মক উপাখ্যানে পূর্ণ। কিন্তু এ সব ছাড়াও মহাভারতে স্বভাবতই কাব্যগুণবর্জিত অন্য বেশ কিছু অংশ আছে; ইতিহাস, ভূগোল, পুরাকাহিনি, উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের বিবরণ, নানা দর্শনপ্রস্থান ও ধর্মানুষ্ঠানের কথা। এগুলি সংযোজিত হয়। একটি মহাকাব্য কোনও উক্তৃঙ্গ মহিমায় আরোহণ করলে পর। সমাজ তখন সে মহাকাব্যকে ব্যবহার করে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। কিছু কিছু প্রাথমিক মহাকাব্যেই শুধু এই সব উপাদান আছে, পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলি এ সব পরিহার করে একটি নিটোল কলেবর লাভ করেছে। এর একটা কারণ, ততদিনে ওই সব আগন্তুক বিষয়গুলি স্বতন্ত্র চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, মহাকাব্যে তাদের সংকলন করবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু ওই নিটোল কলেবারের শিল্পোত্তীর্ণ রূপ ও ওই বহু আনুষঙ্গিক বিষয়ের দ্বারা ভারাক্রান্ত প্রাথমিক মহাকাব্যের মহিমা অর্জন করতে পারেনি। কেন? প্রাথমিক জীবনজিজ্ঞাসার যে একটা অকুণ্ঠ ও তীব্র আকুতি তা শুধু ওই আদিকমহাকাব্যগুলিতেই বিধৃত। পরবর্তীর্ণ কাব্যগুলি এই বিষয়ে আদিকাব্যগুলির উত্তরাধিকারী। তাদেরও জীবনজিজ্ঞাসা আছে এবং বিভিন্ন দেশকালের প্রথম মহাকাব্যগুলিতে তার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও মূল্যবোধের সংকট ও ঐকান্তিকতাতেই তাদের মূল্য নিরূপিত হয়। সে মূল্য বহু পরবর্তীকালের মহাকাব্যেই গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং সর্বদেশকালে কাব্যগুলিকে সমাদৃত করেছে।

কিন্তু আদি মহাকাব্যগুলির একটা স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্য হল, এগুলিই প্রথমবার পৃথিবীতে উচ্চারণ করেছে মানুষের সংশয়, জীবন সম্বন্ধে অতৃপ্তি, অমরত্বের আকাঙক্ষা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সুখ দুঃখের সংগতির অভাবের অভিজ্ঞতায় গভীর হতাশা ও বেদনাদীর্ণ উপলব্ধি: জীবনে কোনও আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান নেই। তবু এই মহাকাব্যগুলি আত্মিক ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে স্থাপন করেছে সেই মানুষকে যে প্রাকৃতিক ও দৈবগত বিপর্যয়ে প্রতিক্ষণে বিপর্যস্ত, যে শেষ পর্যন্ত জীবনে ঐহিক জন্মলাভ করবে না, শুধুমর্মমূলে রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে খুঁজে যাবে জীবনের সেই

নিরঞ্জন মহিমা, যা লাভক্ষতি, জয়পরাজয়কে অতিক্রম করে গেছে। মানুষের শেষতম শত্রু মৃত্যু; গিলগামেশা থেকেই দেখি মানুষ মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমরত্বের সন্ধান করে চলেছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ও কঠিন মূল্যে। মহাভারতেও বক যুধিষ্ঠিরের সংলাপে জীবন ও মৃত্যু, শ্রেয় ও প্রেয়, আপাতবিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব, ধর্মের দ্বান্দ্বিক সত্তা এই সমস্ত বিষয় আলোচিত। কাছে থেকে এবং দূর থেকে জীবনকে দেখতে দেখতে, বহু কঙ্করান্তীর্ণ পথ পার হতে হতে এবং পার হয়ে এসেও, সত্য মিথ্যা ধর্মাধর্মসম্বন্ধে অভ্যস্ত বিশ্বাস বারবার আঘাতে দীর্ণ হওয়ার পর কী বাকি থাকে যা মানুষের জীবনকে মূল্যবান করে তোলে?

মহাভারত নানা ঘটনা ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছে এবং নানা ভাবে এর উত্তর দিয়েছে। স্পষ্ট উক্তিতে, উপাখ্যানে, বিবরণে, রূপকে, সংলাপে জটিল জীবনের আকল্প নির্মাণ করে দু-তিনটি সত্য প্রতিপাদন করেছে: মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, কিছু নেই। এরই অনুকল্প হল, যা কিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত তা সব দর্শন, ধর্ম অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে কোনও ঐকান্তিক সত্যলোকে হিরকের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল ভাস্বরতায় বিরাজ করে। পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরণে দীপাবর্তিকার মতো দীপ্তি বিকীর্ণ করে। মানুষের যে কাজ মানবগোষ্ঠীর পক্ষে হানিকর তা-ই পাপ; যে কাজ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পক্ষে মঙ্গলকর তা-ই পুণ্য। এবং পাপের পথ অর্থ, যশ অর্জনে আপাত ভাবে সমর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত মানবসমাজে ধিকৃত। অপর পক্ষে পুণ্যের, সত্যের পথ সুকঠিন, আমৃত্যু সাধনার পথ, বহু দুঃখযন্ত্রণা এবং পদে পদে বিস্তর ব্যর্থতা, অবসাদ এবং হতাশায় আকীর্ণ এ পথ। যে এ সব সহ্য করে সাহসের সঙ্গে দুঃখবরণ করে বৃহত্তর মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যর্থ, বঞ্চিত ও উপহাসিত হলেও শেষ বিচারে সেই অমরতীয় উত্তীর্ণ হয়। মহাভারত এ কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলেনি; বললে তা কাব্য হত না। বলেছে কাহিনি, উপাখ্যান, সংলাপ ও নানা আপাতবিরুদ্ধ মূল্যবোধের সংঘাত বারে বারে উপস্থাপিত করে। কোথাও নায়ক হেরেছে সাধনার উপযুক্ত সাহস, ধৈর্য, মূল্যবোধে প্রত্যয় ছিল না। বলে, কোথাও বা দুঃসহ মূল্য দিয়ে ঐহিক বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্বকে জয়যুক্ত করেছে। এবং সে জয়কে রেখে গেছে চিরকালের মানুষের আত্মিক উত্তরাধিকার রূপে।

রামের নামে বহু মানুষ ও স্থানের নামে ভারতবর্ষে আছে; তত বেশি নাম–মানুষের ও স্থানের–মহাভারতের নেই। তবু মহাভারত যে ভাবে জীবনের মর্মান্তিক নৈতিক সংকটগুলিকে প্রকাশ্যে এনে চরিত্রগুলির অন্তর-যন্ত্রণা ও তার মধ্যে দিয়ে তাদের নৈতিক উত্তরণ দেখছে, রামায়ণে তেমন সংকট শুধু সীতার জীবনেই দেখিয়েছে এবং এখানে উত্তরণটিও এই অন্যায়কারী অযোধ্যা থেকে জননীর ক্রোড়ে, নিরাপদ ও কাম্য আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে। এক দিক থেকে সীতাই পাঠকের দৃষ্টিতে মহনীয়তর চরিত্র; গ্রন্থটি যার নামে সেই রাম পাঠকের দৃষ্টিতে অনেক নেমে গেলেন।